واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

স্মরণিকা

২০০২

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

CamScanner

সৃষ্টি একাডেমিক স্কুল, টাঙ্গাইল

আবাসিক-অনাবাসিক, প্লে-গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণী
দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রত্যয়
নিয়ে আমাদের পদচারণা

সৃষ্টি কোচিং সেন্টার, টাঙ্গাইল

আবাসিক-অনাবাসিক, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণী
বাংলাদেশের বুকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে আমরা বদ্ধপরিকর

সৃষ্টি জুনিয়র্স, টাঙ্গাইল

আবাসিক-অনাবাসিক
দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী
ক্রমেই যার আভা ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে

সৃষ্টির সর্বোচ্চ সফল্যসমূহ

এস. এস. সিতে ১০জন বোর্ড স্ট্যান্ড, ১জন জিপিএ ৫.০০(এ+) ৫১৫জন স্টার মার্কস,১৭৮ জন 'এ' গ্রেড, ১২৫ জন প্রথম বিভাগ, জুনিয়ার বৃত্তিতে ৪৬ জন ট্যালেন্টপুল, ১৫৯ জন সাধারণ বৃত্তি।
এছাড়া প্রাইমারি বৃত্তিসহ শিক্ষার সকল স্তরে সৃষ্টি বাংলাদেশের বুকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে বদ্ধপরিকর।

যোগাযোগ

সৃষ্টি একাডেমিক স্কুল ঃ বিশ্বাস বেতকা, সুপারী বাগান রোড, টাঙ্গাইল
সৃষ্টি কোচিং সেন্টারঃ ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল
সৃষ্টি জুনিয়র্স ঃ পলাশতলী, টাঙ্গাইল

ফোন ঃ ০৯২১-৫৫৩৮০, ৫৫১৩৫, ৫৫৪০৫, ৫৪৩৭৯, ৫৫৩৭৭ (১২৫-১৩৭)

মোবাইল ঃ ০১৭-১৬২২২৯, ০১৭-১৬৩৮৪৫, ০১৭-১৬৩৮৪৯, ০১১-৮৭০০৫৪

ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-৯২১-৫৫৩৮০

بسم الله الرحمن الرحيم

স্মরণিকা

কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০২

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ১৭৬ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০; ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ৯৫৬৬৭০৫

স্মরণিকা ২০০২

প্রকাশনায়

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

১৭৬ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী

উপদেষ্টামণ্ডলী

অধ্যাপক এ. কে. এম. শামসুল আলম
প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান
অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহহাব লাবীব
অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর

সম্পাদক

ইফতিখারুল আলম মাসউদ

সম্পাদনা পরিষদ

মুহাম্মদ আব্দুল মালেক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান
মুহাম্মদ আব্দুল মতীন
মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম (লিপন)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

কম্পিউটার কম্পোজ : সাজিদুর রহমান

প্রকাশ কাল

যুলক্বা'দাহ : ১৪২২ হিজরী
ফেব্রুয়ারী : ২০০২ খৃষ্টাব্দ
ফাল্গুন : ১৪০৮ বঙ্গাব্দ

শুভেচ্ছা মূল্য : ৩০ টাকা

Smaranika 2002. A Souvenir published on the occassion of the Central Conference of the Jam'iyat Shubban Ahl-al-Hadith Bangladesh, 2002

Edited by : Iftikharul Alam Masud & Published by the same from 176, Nawabpur Road, Dhaka, Bangladesh.

সূচীপত্র

- প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী
- পরিচালকের বাণী
- সম্পাদকীয়
- দারসুল কুরআন : মু'মিনের প্রকৃত পরিচয়
  – মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক সালাফী
- দারসুল হাদীস : আমীর ও ইমারতের স্বরূপ
  – মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন মাওলানা মোহাম্মদ আলী

প্রবন্ধ

প্রবন্ধের নাম	পৃষ্ঠা	লেখক
জাতীয় মূল্যবোধ ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	১৫	প্রফেসর ডক্টর এম. এ. বারী
সভ্যতার চ্যালেঞ্জ মুকাবেলায় মুসলিম ঐক্য ও সংহতি	২২	অধ্যাপক এ. কে. এম. শামসুল আলম
যাত্রা তবে শুরু হোক	৩৭	প্রফেসর এ.এইচ. এম. শামসুর রহমান
শিক্ষা, বিজ্ঞান, আল-কুরআন ও বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী সমাচার	৪৩	প্রফেসর ডক্টর এ. কে. এম. আজহারুল ইসলাম
বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার প্রসারে প্রতিবন্ধকতা	৫১	প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরিচয়	৫৬	ডক্টর আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী
ইকামতে দ্বীনের পূর্ব শর্ত	৬৩	ডক্টর মুহাম্মদ মুজাম্মিল আলী

কবিতা

১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বরের তোহফা	৭০	আব্দুল্লাহ আল মাসউদ

সংগঠন

প্রতিবেদন (কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০২)	৭৪
নতুন সেশনের মজলিসে শূরার (২০০২-২০০৪)	৭৭
আমাদের পরিচয়	৭৮
تعريف موجز لجمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش	৮২

মাননীয় প্রধান পৃষ্ঠপোষকের

বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

যাবতীয় হামদ ও শোকর সেই মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য যাঁর অশেষ মেহেরবানীতে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের যুবসংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০২ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। শুব্বানে আহলে হাদীস এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমাদের তরুণ ও যুবকরা তাদের পাঁচদফা কর্মসূচী তথা ইসলাহুল আকীদা, আদ-দা'ওয়া ওয়াত-তাবলীগ, তানযীম, তাদরীব ও তারবিয়া এবং ইসলাহুল মুজতামা' বা সমাজ সংস্কারের শপথ নিয়ে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে দেখে আমি অনুপ্রাণিত বোধ করছি। এদের মধ্য থেকেই ইনশা আল্লাহ ঈমানে বলীয়ান, আদর্শে অবিচল, নীতিতে অটল এবং সমাজ ও দেশ সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ভবিষ্যতের নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবে। সেই অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের কর্মতৎপরতায় সারাদেশের তাওহীদপ্রেমী যুবকদের মধ্যে এক অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহর ফযল ও করমে সর্বত্রই তারা সংগঠিত, একতাবদ্ধ এবং দীন ও মিল্লাতের সেবায় আত্মনিবেদিত। আমি আশাবাদী যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে চলে আসা সালাফী তথা আহলে হাদীস আন্দোলনের ধারাকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সমুন্নত রাখতে এবং দেশ থেকে শিরক-বিদ'আতকে সমূলে উৎপাটন করতে এরা সমর্থ হবে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এদের সহায় হোন।

আমি শুব্বানের কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০২-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি, সেই সাথে যারা তাদের মেধা, শ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দিয়ে এই উদ্যোগকে সফল করে তুলল তাদের সকলের সুন্দর ও সফল ভবিষ্যতের জন্য দো'আ করছি। প্রভু তাদের উত্তম প্রতিদানে পুরস্কৃত করুন এবং তাঁর দীনে খাতীনের জন্য তাদের এই নিঃস্বার্থ খেদমতকে কবুল করুন।

اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم -

ঢাকা
৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০২

(প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল বারী)
সভাপতি
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

পরিচালকের

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন '০২ উপলক্ষে স্বরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

অপসংস্কৃতি আর অপসাহিত্যের দোর্দণ্ড প্রতাপে যখন আমাদের স্বকীয়তা ও আদর্শ-ঐতিহ্য ধ্বংসের মুখোমুখি তখন এই স্বরণিকার প্রকাশ আমাদের বিশ্বাস ও তাহযীব-তমদ্দুনকে সমুন্নত করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন ক্ষমতা ও স্বার্থের দ্বান্দ্বিক ও স্নায়ুবিক লড়াইয়ে নিদারুন ভাবে জর্জরিত এরূপ সংকটকালেও বাস্তবতার কাছে হার না মেনে যে সকল তরুণ তাদের মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্বরণিকাটির প্রকাশে ভূমিকা রেখেছে তাদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

পরিশেষে আমাদের যুবকরা সত্যিকার ঈমানদার, দেশপ্রেমিক, জ্ঞানী ও সাহসী মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠুক রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে এই দো'আই করছি।

তারিখ : ০৬.০২.২০০২

(অধ্যাপক) ওবায়দুল্লাহ গযনফর
পরিচালক
শুব্বান বিভাগ
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা ও শোকর মহান রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহ জাল্লা শানুহূর জন্য যার অপার অনুগ্রহে শত অযোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই স্মরণিকা প্রকাশ করা সম্ভব হল। দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ (সা) এর শানে যাঁর প্রদর্শিত পথই একমাত্র অনুসরণীয়।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর একমাত্র অঙ্গ যুব সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ দীন ইসলামকে যথার্থরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অপসংস্কৃতি আর বিজাতীয় সভ্যতার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে এদেশের যুবকরা যাতে নিজস্ব আকীদা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ধর্মহীনতার স্রোতে ভেসে না যায় সে দিকটা সক্রিয় বিবেচনায় রেখে শুব্বানে আহলে হাদীস নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এ স্মরণিকা প্রকাশ সে সংগ্রামেরই অংশ।

মননশীলতার দুর্ভিক্ষের এই যুগসন্ধিক্ষণে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যখন অশ্লীলতা ও নগ্নতার বিষাক্ত থাবা, সৃজনশীল সাহিত্যের যখন বড়ই অভাব তখন এ স্মরণিকার প্রকাশ আমাদের কাংখিত চেতনাকে উদ্দীপ্ত করতে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। যে সকল জাতীয় ব্যক্তিত্ব, প্রাজ্ঞজন লেখা দিয়ে আমাদের স্মরণিকার গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করে তাঁদেরকে ছোট করতে চাইনা। মহান রব তাদের দীর্ঘ জীবন দান করুন।

আমাদের অদক্ষতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ 'স্মরণিকা' কে সমৃদ্ধ করতে আমাদের আন্তরিকতার ঘাটতি ছিলনা। তবুও যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। পরিশেষে এ স্মরনিকা প্রকাশে যাদের দিক নির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শ আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছে এবং এ ব্যাপারে যারা সময়, মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদের স্মরণিকা প্রকাশে সহায়তা করেছেন তাদেরকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

সম্পাদক

মু'মিনের প্রকৃত পরিচয়

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক সালাফী*

بسم الله الرحمن الرحيم

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ○ واذ تقول للذى انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا ○ (الاحزاب : ٣٦-٣٧)

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ

وما كان বাক্যটির ভাবার্থে এ কয়েকটি বাক্য আসতে পারে لا يصح (ঠিক নয়) لا ينبغى (উচিত নয়) لا يليق (সমীচীন নয়)। لهم الخيرة من امرهم বাক্যটির মর্মার্থ হলো ঃ থাকবে না তাতে তাদের রায় বা ইচ্ছা, বরঞ্চ তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতঃ তাঁদের যাবতীয় আদেশ ও নিষেধকে মান্য করা (তাফসীর তাবারী)।

অনুবাদ ঃ

আয়াতের তরজমা হচ্ছে যখন আল্লাহ এবং তার রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা দিবেন, তখন সে বিষয়ে কোন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীর ভিন্ন রায় বা ইচ্ছা থাকা সমীচীন হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে (সা) মানেনা বরঞ্চ সে বিষয়ে ভিন্নমত ও ইচ্ছাকে প্রধান্য দেয় সে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্ত। স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন তুমি বলেছিলে সে ব্যক্তিকে যাকে তুমি নিয়ামত দান করেছ এবং আল্লাহও তাকে নিয়ামত দান করেছেন যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা থেকে বিরত থাক। আর তুমি আল্লাহকে ভয় করো। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছো আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবেন। তুমি (নিন্দার ভয়ে) মানুষকে ভয় করছো অথচ আল্লাহ বেশী হক রাখেন যে তুমি তাঁকে ভয় করবে। অতঃপর যায়েদ (রা) যখন যায়নাবের (রা) ব্যাপারে উদ্দেশ্য হাসিলে সক্ষম হলেন, তখন আমরা তোমাকে তার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম। (ইহা এ জন্য করলাম যে) তা'হলে মু'মিনগণের উপর কোন অসুবিধা থাকবে না তাদের পোষ্য পুত্রের স্ত্রীগণকে বিয়ের ক্ষেত্রে যখন তারা তাদের স্ত্রীগণ হতে (তালাক দিয়ে) উদ্দেশ্য হাসিলে সক্ষম হবে। আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়িত হয়েই থাকে। (৩৩:৩৬-৩৭)

শানে নুযূল ঃ

আয়াত দুটো একটি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট। ঘটনাটি এই ঃ

নবীজীর (সা) পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারেসা যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন নবীজী (সা) স্বীয় ফুফাতো বোন যায়নব বিনতে জাহ্‌শকে তাঁর সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য পয়গাম পাঠান। প্রথমতঃ যায়নাব (রা) বুঝলেন এ পয়গাম নবীজীর (সা) নিজের জন্য; কিন্তু পরবর্তীতে যখন বুঝলেন এ প্রস্তাব তাঁর নিজের জন্য নয়, তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারেসার জন্য, তখন তিনি এবং তার ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহ্‌শ এ প্রস্তাবের প্রতি এ বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা তো কুরাইশ বংশের। আমরা

* অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

বংশগত দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তখন তাদের এ মতের বিরুদ্ধে এ আয়াত দুটির প্রথমটি নাযেল করেন (وما كان لمؤمن الخ)

তবে শেষের আয়াতেও একটি মাস্'আলার সমাধান রয়েছে যা সম্পর্কে একটু পরেই আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

ব্যাখ্যা ঃ

وما كان لمؤمن الخ এ আয়াতটিতে নির্দেশ রয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) যখন কোন হুকুম কারো প্রতি বাধ্যতামূলক করে দেন, তখন সে হুকুমটি মান্য করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তা না করার অধিকার মু'মিনের থাকে না। এমন আদেশ যারা মানে না বরঞ্চ তাতে নিজেদের ইচ্ছা ও আভিজাত্যকে প্রাধান্য দেয়, তাদেরকে স্পষ্ট পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে আয়াতের শেষাংশে। উল্লেখ্য যে এ আয়াতটি কোন কাফের ও মুশরিকের ব্যাপারে নাযেল হয়নি। নাযেল হয়েছে এমন দুই ব্যক্তির ব্যাপারে যারা মহানবীর (সা) সাহচর্য হাসিলে ধন্য হওয়ার সাথে সাথে আমল-আকীদার দিক দিয়েও তারা চরম উন্নতি লাভ করেছিলেন। সালাত, সওম, যাকাত এবং হাজ্জসহ যাবতীয় আমলে তাঁরা ছিলেন অগ্রগামী। তবে কেন তাঁরা আল্লাহর কাছে দোষী বলে আখ্যায়িত হলেন? এর কারণ হলো তাঁরা আল্লাহ এবং রাসূল এর (সা) ফয়সালার উপরে স্বীয় মত ও ইরাদাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে তাঁরা চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। এমনিতো ضلالا শব্দটি مفعول مطلق হওয়ার কারণে তাকীদ বুঝাচ্ছে। তদুপরি তার সেফাত مبينا শব্দটি আরো এসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তাদের গোমরাহীতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হলো মু'মিন-মু'মিনার প্রকৃত পরিচয়। এখন আমরা এই মানদণ্ডে বিচার করে দেখবো আমাদের জীবনের সর্বস্তরকে। কেননা ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ইসলাম দিয়েছে সঠিক সমাধান। নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে যদি আমরা লক্ষ্য করি তা হলে আমাদের জীবনের সর্বস্তরের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের সাথে আমাদের মেনে চলা অবাঞ্ছিত নিয়ম-কানুনের অনেক ক্ষেত্রে মিল খুঁজে পাবো না। কেননা আজকে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা আল্লাহর দেয়া বিধানের প্রতি কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ করি না। অতএব আমরাও এ আয়াতে বর্ণিত অপরাধে অপরাধী হয়ে যাচ্ছি। এ মর্মে একটি হাদীসও প্রণিধানযোগ্য।

لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به (رواه في شرح السنة)

"তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ ঈমানের দাবী করতে পারে না যতক্ষণ তার খাহেশ, পরিকল্পনা এবং ইচ্ছা অনুসারী না হয় সেই বিধানের যা নিয়ে আমি এসেছি।" উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসটিকে আমরা সামনে রেখে নিজেকে প্রশ্ন করবো- ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের যে নীতিমালার প্রতি আমরা আনুগত্য করছি বা অনুসরণ করছি তাতে কি ইহ-পরকালে আমাদের নাজাত আছে? এ প্রশ্নের উত্তর আসবে 'না'।

উপরোক্ত আয়াত নাযেল হওয়ার পর যায়নাব এবং তার ভ্রাতা আব্দুল্লাহ তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করেন এবং বিয়েতে রাযী হয়ে যান। তাঁর মহর নির্ধারিত হয়েছিল দশটি লাল দিনার (অনুমান ঃ চার তোলা স্বর্ণ) এবং ষাটটি দিরহাম) অনুমান ঃ আঠারো তোলা রৌপ্য)। অতঃপর তারা তাদের দাম্পত্য জীবন এর যাত্রা শুরু করলেন। কিন্তু তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে মিল হলো না। যায়েদ (রা) যায়নাব (রা) সম্পর্কে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত কৌলীন্যাভিমান এবং আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগ পেশ করতেন মহানবীর (সা) কাছে। ক্রমশঃ উভয়ের মনোমালিন্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিশেষে আসল

তালাকের পর্ব। যায়েদ (রা) একদিন মহানবীর (সা) খেদমতে এসে যায়নাবকে (রা) তালাক প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে মহানবী (সা) তাকে তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে নির্দেশ দেন। কিন্তু এতে কোন ফল হলো না। হযরত যায়েদ তাকে তালাক দিয়েই দিলেন। ইদ্দত পালনের পর হযরত যায়নাবের সাথে মহানবী (সা) পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন একথা আল্লাহ মহানবীকে (সা) ওহী দ্বারা পূর্বেই অবহিত করেছেন। কিন্তু দুটো কারণে মহানবী (সা) তা প্রকাশ করেননি। প্রথমতঃ তালাক দেওয়া যদিও শরী'য়তে জায়েয, কিন্তু শরী'য়তে জায়েয বস্তু সমূহের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণিত ও অবাঞ্ছিত।

দ্বিতীয়ত ঃ মহানবীর (সা) মনে এ ধারণা সৃষ্টি হলো যে, হযরত যায়নাবকে তালাক দেয়ার পর যদি তিনি বিয়ে করেন, তা'হলে বর্বর যুগের নিয়মানুযায়ী আরববাসীরা তাঁকে এ বলে অপবাদ দিবে যে, মুহাম্মদ (সা) পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন। কেননা তারা সকল ব্যাপারে পালক পুত্রকে প্রকৃত পুত্র তুল্য মনে করতো। تخفى في نفسك ما الله مبديه আয়াতাংশের অর্থ এটাই। কিন্তু কোন কোন মুফাসসের নবী (সা) এর চরিত্র কলঙ্কিত করতে সহায়ক এমন কতকগুলো ইসরাঈলী ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে ঘটনা আদৌ সত্য নয়। তারা বলেছেন, একদা যায়নাবকে (রা) মহানবী (সা) একাকী ঘরে দেখতে পান এবং তার উপর আশেক হয়ে পড়েন (নাউযুবিল্লাহ)। তখন তাঁর মনে যায়নাবকে বিয়ে করার বাসনা জন্মে। যেহেতু এটা একটি লজ্জাযুক্ত ব্যাপার এ জন্যে তিনি (সা) তা গোপন রাখতেন। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বললেনঃ تخفى في نفسك ما الله مبديه

যেহেতু যায়নাব (রা) যায়েদের (রা) সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ এবং তার আদেশের কাছে স্বীয় প্রবৃত্তিকে সঁপে দিয়ে যায়েদকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিলেন, তখন রাব্বুল আলামীন তাঁকে এ ত্যাগের বিনিময়ে এমন এক ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে দিলেন যিনি সাইয়্যেদুল মুরসালীন এবং সৃষ্ট জীবের মধ্যে অদ্বিতীয়। শুধু তাই নয় তাঁর বিয়েতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাধারণ ভাবে প্রচলিত নিয়ম বিধানের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে স্বয়ং তা সম্পন্ন করে দিয়ে তার প্রতি এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। নবীজীর (সা) অন্যান্য বিবিদের নিকট যায়নাবের (রা) এই উক্তি "তোমাদের বিবাহ তোমাদের অভিভাবকগণ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে; কিন্তু আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আকাশে সম্পন্ন করেছেন" দ্বারাও এ মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা প্রমাণিত মাস'আলাটির বর্ণনা এই যে, তৎকালীন বর্বর যুগের সমাজ পৌষ্যপুত্রকে যাবতীয় বিষয়ে প্রকৃত পুত্রতুল্য মনে করতো। তালাক দেয়া এবং বিধবা হওয়ার পর যেমন পিতা পুত্র বধূকে বিয়ে করতে পারে না তেমনি পালিত পিতাও সেরূপ পালিত পুত্রবধুকে পরিণয় সূত্রে বরণ করতে পারে না।

যায়েদ বিন হারেসা জনৈক ব্যক্তির কৃতদাস ছিলেন। মহানবী (সা) তাঁকে ওকাজ নামক বাজার হতে ক্রয় করেন এবং পরে তাঁকে মুক্ত করেন তখন তার বয়স ছিল অল্প। যায়েদ মহানবীর (সা) বাড়ীতে পৌষ্য পুত্র হিসেবে বরিত হলেন। আরব বাসীদের নিয়মানুযায়ী মক্কাবাসীগণ তাকে زيد بن محمد (যায়েদ বিন মুহাম্মদ) বলে সম্বোধন করতে লাগলো। কিন্তু রাব্বুল আলামীন এর ইচ্ছা সমাজে এইরূপ কুপ্রথা না রাখা। তাই সে প্রথাকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে আখ্যায়িত করে একেবারে সমাজ থেকে সেটি মুলোৎপাটন করার উদ্দেশ্যে নাযিল করা হলো এই দুটো আয়াতকে ঃ

اذ تقول للذى انعم الله الخ ادعوهم لآبائهم الخ

বহুদিনের শিকড় গাড়া এ কুপ্রথা সমাজ থেকে উৎখাত করার জন্য প্রয়োজন ছিলো এমন এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপের যাতে এ কুপ্রথা সমূলে উৎপাটিত হয়ে সমাজ কলুষমুক্ত হয়ে যায়।

এ জন্যেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর আইন বাস্তবায়নকারী মুহাম্মদ (সা) দ্বারা সে দুটো কুপ্রথাকে সমাজ থেকে মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা করলেন। এর থেকে সমাজ বা দেশে আইন বাস্তবায়নের ন্যায় নীতির শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে। আর তা হলো আগে নিজে পালন করা বা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

ادعوهم لآبائهم আয়াতটি নাযেল হওয়ার পর সাহাবীগণ যায়েদকে (রা) যায়েদ বিন মুহাম্মদ নামে সম্বোধন করা পরিহার করলেন। এতে যায়েদের (রা) মহানবীর (সা) সাথে পৈত্রিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলো। এ বিরহ বেদনায় তিনি কি পরিমাণ কাতর হয়ে পড়েছিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে নিম্নোক্ত একটি ঘটনা থেকে তা কিছুটা অনুমেয়। ঘটনাটি হাদীসগ্রন্থ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, মুসনাদ আহমাদ, ইবনে মাজাহ্, হাকেম, ইবনু খুযাইমাহ্, ইবনু হিব্বান, ইমাম শাফেয়ী, বাইহাকী, তাবারানী এবং আবু ই'য়ালাতে আছে। যারা প্রত্যক্ষদর্শী তারা হলেন ঃ উবাই ইবনে কা'ব, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আনাস বিন মালেক, সাহাল বিন সা'দ- আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আবু সাঈদ, বুরায়দ বিন খাতীব, উম্মে সালেমাহ এবং মুত্তালাব বিন আবু ওদামাহ।

ঘটনাটি এই

মসজিদে নববীর জন্য মিম্বর তৈরীর পূর্বে মহানবী (সা) খেজুরের শুকনা কাণ্ডে ঠেস দিয়ে খুতবাহ প্রদান করতেন। পরবর্তীতে মিম্বর তৈরী হয়ে গেলে সেটি মসজিদে যথাস্থানে রাখা হলো। আর সে শুকনা খেজুরের কাণ্ডটি মসজিদের এক কোণে রাখা হল। একদিন আল্লাহর রাসূল (সা) খুতবা আরম্ভ করেছেন, তখন ঐ কোণে রাখা খেজুরের কাণ্ডটির আওয়াজ আসতে আরম্ভ করল। প্রত্যক্ষদর্শীগণের কেউ বলেন যে, সে আওয়াজটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর আওয়াজের মত ছিল। আবার কেউ বলেন যে, সন্তানের কান্নার মত ছিল সে আওয়াজটি। কেন তার এ আহাজারী? কি কারণে সে কাঁদলো? এর কারণ খোঁজ করে পাওয়া গিয়েছিল যে, সে আজীবনের মত মহানবীর (সা) স্পর্শ করা এবং আল্লাহর যিকর শ্রবণ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো, এই বিরহ বেদনায় কাতর হয়েই এইরূপ কান্নার আওয়াজ করেছিল। বোধ শক্তিহীন, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি-হীন একখানা শুকনো কাঠ যদি এই বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে না পারে তাহলে সৃষ্টির সেরা মানুষ কিভাবে এই বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে পারে? কিন্তু যায়েদ (রা) ছিলেন ধৈর্য্যের আধার। বিরহ বেদনায় উথলে উঠা আহাজারীর হাজারো ঢেউ সামলে নিলেন তিনি অকাতরে। আর আল্লাহর নাযিলকৃত আয়াত ادعوهم لآبائهم এর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হয়ে সর্বাধিক উৎকৃষ্ট সম্মানিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 'মহানবীর পুত্র' এই সম্পর্ককে ছিন্ন করতে সম্মত হয়ে গেলেন তিনি। এ জন্যে রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে তাঁর এ ত্যাগ ও কৃতিত্বের জন্য এক মহা পুরস্কারস্বরূপ তাঁর নামটি মহাগ্রন্থ কালামে পাক কুরআন মাজিদে সন্নিবেশিত করে দিয়ে চিরস্মরণীয় করে দিলেন কিয়ামত পর্যন্ত। মুসলমান নর-নারী কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করার সময় বিশেষ করে খাতমে কুরআনের সময় তাঁর নামটিও তেলাওয়াত করতে থাকবে। এটা এমন একটি তোহফা যে, শ্রেষ্ঠ ও অধিক মর্যাদাশীল সাহাবাও তা থেকে বঞ্চিত আছেন। শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে মুসলিম খলীফা যুদ্ধে তাঁকে সেনাপতিত্বের মহান দায়িত্বও অর্পণ করে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

দুনিয়ার সকল লোভ-লালসা, স্বার্থের উর্দ্ধে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশ। মুসলমান নর-নারী দুনিয়ার কোন মোহে পড়তে পারে না। সর্বক্ষেত্রে তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশকেই শিরোধার্য মনে করে। এ জন্যেই তারা ইহ-পরজগতে চরম সুখ, শান্তি, মান, ইজ্জত লাভে সক্ষম হন, অন্যরা নয়। এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে উপরোক্ত আলোচনা থেকে। যদি আমরা সেরূপে আমাদের জিন্দেগী তৈরী করতে পারি তা হলে আমরাও ইহ-পরজগতে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি মান-ইজ্জত হাসিলে সক্ষম হবো, অন্যথায় নয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে প্রকৃত মু'মিন হবার তাওফীক দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন,

আমীর ও ইমারতের স্বরূপ

মাওলানা মোঃ ইবরাহীম বিন মাওলানা মোহাম্মদ আলী*

من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد اطاعنى ومن يعصى الامير فقد عصانى - متفق عليه .

অনুবাদ ঃ

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। অনুরূপভাবে যে আমীরের অনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমারই অবাধ্যতা করল" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ

ছোট এই হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বর্তমান প্রেক্ষিতে এটি আরও তাৎপর্য বহন করছে। মূলতঃ হাদীসটিতে ইসলামী নেতৃত্বের মর্যাদা ও ধরন বর্ণিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায় 'আমীর' এর স্বরূপ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া হয়েছে। আজকের দারসুল হাদীসে আমীর ও ইমারত সম্পর্কেই আলোচনা উপস্থাপিত হবে ইনশা আল্লাহ। ইমারত দু'প্রকারের যথা ঃ (১) রাষ্ট্রীয় ইমারত (২) বিকল্প ইমারত। নিম্নে এতদসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো ঃ

(১) রাষ্ট্রীয় ইমারত ঃ

ইমরাত অর্থ রাষ্ট্র ও আমীর বলতে রাষ্ট্রপ্রধানকে বুঝায়। ইমারত শব্দের দ্বারা সাধারণত ইসলামী রাষ্ট্র বুঝায় ও আমীর বলতে মুসলিম শাসককে বুঝায়। তবে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে আমরা যে প্রচলিত বর্তমান রাষ্ট্র বুঝি সেটি নয়। কারণ ঐ সব রাষ্ট্রগুলিকে ইসলামী রাষ্ট্র এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলি যে দেশের নাগরিক অধিকাংশ বা সকলেই ইসলামের দাবীদার বা মুসলমান অথবা শাসক-জনগণ সকলেই ইসলামের দাবীদার। কিন্তু আসলে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে ঐ রাষ্ট্রকে বুঝায় যে রাষ্ট্রের শাসক মুসলিম ও তার নাগরিকের উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের বিধিবিধান প্রযোজ্য, এতে জনগণের অধিকাংশ অমুসলিমই থাকুক না কেন। উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম ইমারত ও আমীরের স্বরূপ দু'ধরনেরঃ একটি হল, আমীর নিজের জীবনে ও তাঁর রাষ্ট্রে ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গরূপে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন করেন। এমন আমীর ও তার রাষ্ট্রের বা ইমারতের প্রতি প্রতিটি নাগরিকের আনুগত্য বা বশ্যতা স্বীকার ও সর্ব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও আমীরকে সর্ব প্রকারের সহযোগিতা করা ওয়াজিব এবং আমীর বা ইমারতের প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা, অসম্মান, অসহযোগিতামূলক ভাব দেখানো বা আমীরের মধ্যে সামান্য দুর্বলতা বা ক্রটি পরিলক্ষিত হওয়া মাত্র সমালোচনায় ফেটে পড়া বা বিদ্রোহ ঘোষণা করা বা তার

* শিক্ষক, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজিরা বাজার, ঢাকা।

বিরুদ্ধে দল গঠন করা বা জন সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা ইত্যাদি সকল প্রকারের কর্মকাণ্ড শরী'য়তে সম্পূর্ণভাবে হারাম ও ইসলাম বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ন্যায়পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান একজন আমীরের আনুগত্য করার মধ্যেই নবী (সা) এর প্রতি আনুগত্য নিহিত।

উপরোক্ত হাদীসটির দ্বারা একথা পরিষ্কার যে, এই আনুগত্যের ধারা ব্যক্তি থেকে আমীর, আমীর থেকে নবী (সা) আর নবী (সা) থেকে আল্লাহ এই ধারার মধ্যে কেউ ব্যতিক্রম করলে বা ধারার অংশ বিশেষ বাদ দিলে তার জীবন কখনই ইসলামী জীবন হিসাবে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না এবং তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। ঐ ব্যক্তি যতই যোগ্যতাসম্পন্ন বা সুনাম সুখ্যাতি ধন্য এবং ব্যক্তিগত ভাবে যতই খোদাভীরু পরহেজগার হন না কেন।

এ ব্যাপারে অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ [সা] এরশাদ করেছেন ঃ

من كره من اميره شيئا فليصبر فانه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية - متفق عليه .

"তোমাদের কেউ যদি তার আমীরের মধ্যে কোন অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করে তাহলে সে যেন ধৈর্য্য ধারণ করে, কারণ যে ব্যক্তি ইমারত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু" (বুখারী ও মুসলিম)।

দ্বিতীয় রাষ্ট্রের ধরন বা রূপ হলো রাষ্ট্রের জনগণ অধিকাংশ বা সকলেই মুসলমান। রাষ্ট্র প্রধানও ইসলামের দাবীদার তথা ক্ষেত্র বিশেষে তার জীবনে কিছু কিছু ইসলামী অনুশাসন পালনের দৃষ্টান্ত ও পাওয়া যায় যেমন হজ্জ, উমরা, ঈদের নামায ইত্যাদি। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইন কানুনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই বরং অনেক ক্ষেত্রে তার বিপরীত অবস্থাই দেখতে পাওয়া যায় এমনকি জনগণ যদি স্বউদ্যোগে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতিকে নিজ ব্যক্তি জীবনের বাইরে সামাজিক জীবনে যথাযথভাবে রূপ দেওয়ার সামান্যতম চেষ্টাও চালায় তাহলে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কারের বদলে তিরস্কার করা হয় ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রে এ চিত্রই দেখা যায়। আবার কোন কোনটির অবস্থা আরও শোচনীয়, যেখানে ব্যক্তিগত ভাবে দীন পালন করলেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন অতি সম্প্রতি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মুসলিম নামধারী রাষ্ট্র তুরস্কে, যেখানে সর্বোচ্চ আদালত একজন মহিলা সংসদ সদস্যার (যার নাম মার্ভিকাবাকসি) বিরুদ্ধে মাথায় হেজাব পরার কারণে শাস্তির নির্দেশ দিয়েছে। অথচ তিনি এ হেজাবের পক্ষে প্রচারণায়ও নামেননি বা উড়না বাধ্যতামূলক করার জন্য মুসলিম নামধারী তাগুত সরকারের নিকট দাবীও জানাননি বরং তা ছিল একেবারে ব্যক্তিগত পছন্দ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ। ইসলামের সমান্যতম একটি আচারকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে বাস্তবায়িত করায় তাঁকে হারাতে হয়েছে তাঁর মূল্যবান নাগরিকত্বকে। অথচ তথাকথিত সভ্য পৃথিবীর গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের ফেরিওয়ালারা কিংবা নারী স্বাধীনতার মতলবী প্রচারকগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করে। এভাবেই চলছে আরও অনেক নামধারী মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামের অবমূল্যায়ন। আমাদের দেশেও এর অনেক উদাহরণ আছে। এ সকল নামধারী মুসলিম রাষ্ট্রে জাহেলী আরবের

শাসনের চেয়েও জঘন্য অবস্থা বিরাজমান, কারণ সেখানে ঘরের ভিতরে বা নির্জন গুহায় বা ব্যক্তিগত জীবনে সকল ধর্মের বিধিবিধানকে মান্য করার পথে কোন বাধা বা শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না।

(২) বিকল্প ইমারত ঃ

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বিশ্বের শুরু লগ্ন থেকে দুইটি শক্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘাত চলে আসছে– তাহলো ডান শক্তি ও বাম শক্তি অর্থাৎ এলাহী শক্তি ও শয়তানী শক্তি। এই দুই শক্তির সমর্থকেরা সর্বদা চেষ্টায় লিপ্ত থাকে স্ব স্ব পক্ষের ক্ষমতা সঞ্চয় বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারীদের আপ্রাণ চেষ্টা থাকে শয়তানী কর্মকান্ডকে প্রতিহত করা ও দীনে এলাহী প্রতিষ্ঠা করা। আবার শয়তানী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারীদের চেষ্টা তার সম্পূর্ণ উল্টোটা। অর্থাৎ আল্লাহর দীনকে প্রতিহত করা ও শয়তানী কাজের বিস্তৃতি ঘটানো।

তাই শয়তানী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারীরা প্রকৃত শয়তান হোক বা মানবরূপী শয়তান হোক আল্লাহর ভাষায় সকলেই শয়তান হিসাবে গণ্য হবে এবং শয়তান ও শয়তানী শক্তির মূলোৎপাটনের জন্য তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণসহ যাবতীয় কৌশল অবলম্বন করা একজন মু'মিনের ধর্মীয় দায়িত্ব। আর এ মিশনে সফলকাম হওয়ার জন্য প্রয়োজন যোগ্যতার, প্রয়োজন শক্তির, প্রয়োজন একতার আর এ সবকিছু অর্জন করতে হলে তার পূর্বশর্ত একটি সংগঠন ও সংগঠকের। অর্থাৎ একজন আমীর ও ইমারতের অস্তিত্বের। এ ইমারতকেই বলা হয় বিকল্প ইমারত বা অভ্যন্তরীণ ইমারত আর এ ইমারত সম্পূর্ণভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ ও অত্যন্ত জরুরী। তা না হলে মানুষের ঘাড়ে চেপে বসা শয়তানী তাগুতী শক্তির উচ্ছেদ সাধন অথবা দুর্বল করে দিয়ে আল্লাহর কানুন বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত করা যাবে না বা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر- ال عمران - ١١٠.

অর্থাৎ তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের জন্য নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। মহান আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا : النساء ٧٦

অর্থাৎ তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।

রাসূলুল্লাহ (সা) এ বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করে এরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ

من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان - رواه مسلم.

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় সংঘটিত হতে দেখে তাহলে তা শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিহত

করবে আর যদি শক্তি প্রয়োগে অক্ষম হয় তাহলে মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করবে তারও যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। এর পরে ঈমানের স্তর বা বাস্তবতা নেই (মুসলিম)।

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে সাধারণভাবে সকল মুসলমানকে সব ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ও সৎ কাজের প্রতি আহবান করার কথা বলা হয়েছে। এতে অন্যায়কারী শাসক হোক আর শাসিতই হোক, ধনী হোক আর গরীব হোক, কৃতদাস হোক আর স্বাধীন হোক সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সংক্ষিপ্ত হলেও এ আলোচনায় মোটামুটি স্পষ্ট যে রাষ্ট্র ইসলামী না হলে এর সীমারেখার ভিতরে কোন গোষ্ঠী বা সহীহ আক্বীদাভুক্ত কোন সম্প্রদায়কে নিয়ে আল্লাহর যমীনে তাঁর আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অপরিহার্য দায়িত্ব আদায়ের নিমিত্তে একজন সৎ নিষ্ঠাবান নেতা তথা আমীরের অধীনে, ইমারত বা জমঈয়ত প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব ও আল্লাহর দলভুক্ত সকল মু'মিনকে এ আমীরের অধীনে থেকে তাঁর ও তাঁর সংগঠন বা ইমারতের প্রতি সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও আনুগত্য প্রদর্শন করত: তাঁর উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য সার্বিক কাজে অংশীদার হওয়া ফরয ও জরুরী। কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ কথায়, কাজে বা আচরণে প্রকাশ পেলে তার ঈমানের দাবী মিথ্যায় পর্যবেশিত হবে, তিনি যতই আল্লাহ ভীরুতা এবং পান্ডিত্য প্রদর্শন করুন না কেন। কারণ সত্যের মাপকাঠি ব্যক্তি সুখ্যাতি বা পান্ডিত্য নয়- মাপ কাঠি হচ্ছে আল-কুরআন ও আল হাদীস। তাই আসুন আমরা সকলেই কি করেছি, কি করছি তা না ভেবে কি করব বা আমাদের কি করণীয় সেদিকে দৃষ্টি ফিরাই। আমাদের সকল ভেদাভেদ ও ব্যক্তি স্বার্থ পরিহার করে দীনের স্বার্থ ও পরপারের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে আবার ফিরে যাই আমাদের হারানো ঠিকানায়- আমাদের একমাত্র 'ইমারত' জমঈয়তে আহলে হাদীসের ছায়াতলে। যাতে করে আমাদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, রহিত না হয় আমাদের অগ্রযাত্রার ধারবাহিকতা এবং আমাদেরকে দাঁড়াতে না হয় শেষ দিনে আল্লাহ, রাসূল (সা) ও মু'মিনদের সামনে জবাবদিহিতার জন্য। তাই সময় থাকতে আসুন আমরা সকলে ভাই ভাই হয়ে যাই, বাস্তবায়ন করি নবী (সা) এর রেখে যাওয়া অমূল্য অসীয়ত ঃ

ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا .

অর্থাৎ তোমরা পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ করোনা, হিংসা করো না, বিদ্বেষ করো না, চক্রান্ত করো না, তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও (বুখারী ও মুসলিম)।

وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم -

জাতীয় মূল্যবোধ ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী*

বিগত জানুয়ারি মাসে (১৯৯৭) সরকার কুদরাত-এ-খুদা কমিশন-এর সুপারিশমালার উপর ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ছুয়ান্ন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছেন (কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের সদস্য ছিলেন মোট উনিশ জন)। অতীতেও এ জাতীয় অনেক কমিটি গঠিত হয়েছে এবং তাঁরা অনেক মূল্যবান সুপারিশও পেশ করেছেন। সেগুলো কতটা অনুশীলিত ও অনুসৃত হয়েছে সেটা অবশ্য অন্য ইতিহাস। এদিকে এ কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪)-এর তের বছরের মধ্যেই সরকার তাঁদের শাঃ ৮/১০ এম-৮/৮৬/২৭৬/১৫০ শিক্ষা সংখ্যক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনাব মফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে আর একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই কমিশন তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। এরপর কি ঘটেছে আমাদের জানা নেই। আমার এক সহকর্মী প্রফেসর সেকান্দার আলী ইব্রাহিমী ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা থেকে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর এক গ্রন্থে এ জাতীয় বিভিন্ন কমিটি কমিশন রিপোর্টের যে ফিরিস্তি দিয়েছেন তাতে বিখ্যাত স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট ছাড়াই চল্লিশটি রিপোর্ট ও তাদের মুখ্য সুপারিশের উল্লেখ রয়েছে। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'ঠান্ডা গুদামে' এ সবগুলির কপি পাওয়া যাবে কিনা সেটা অবশ্য সুধীজনই বলতে পারেন।

উপমহাদেশ বিভাগের পর পাকিস্তান আমলে প্রণীত শরীফ কমিশন এবং পরবর্তীতে বিরচিত কুদরাত-ই-খুদা কমিশন ও মফিজ উদ্দিন কমিশন স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। লক্ষ্যণীয়, তিনটি রিপোর্টেই রিপোর্ট রচনার সময় ও প্রেক্ষিত তাদের সুপারিশমালার উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। শরীফ কমিশন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলছেন :

"It is axiomatic that the educational system of a country should meet the individual and collective needs and aspirations of the people of the country. ...."

"Our educational system must play a fundamental part in the preservation of the ideals which led to the creation of Pakistan and strengthen the concept of it as a unified nation. (Report of the Commission on National Education, January- August 1959, Introduction : Paragraphs 26 & 28).

কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের মতে :

"১.১. শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্খা রূপায়ণের ও ভবিষ্যত সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাঁদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক

---

*. সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; সাবেক চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন; সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর রাজশাহী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষার মূলনীতির সঙ্গে এই সাংবিধানিক নীতিমালার যোগসাধন করে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ নির্ধারণ করা যায়।

১.২. দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব .....

(ক) জাতীয়তাবাদ ......

(খ) সমাজতন্ত্র ....

(গ) গণতন্ত্র ......

(ঘ) ধর্মনিরপেক্ষতা ......

(বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪, অধ্যায় ১ ঃ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী)

এ ক্ষেত্রে মফিজ উদ্দিন আহমদ কমিশনের সুপারিশ হলো ঃ

"১.১. বাংলাদেশের শিক্ষা হবে সার্বজনীন। সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের ভিতর গড়ে তুলতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সচেতনতা।

১.২ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে সুন্দর ও সুখী জনজীবন ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা, নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা এবং চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ তৈরি করা। সেই সাথে সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি তৈরি করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।"

(বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, অধ্যায় ১ ঃ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য)।

তিনটি রিপোর্টের সাথেই সম্পৃক্ত ছিলেন দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবৃন্দ। অথচ লক্ষ্য করার বিষয়, তাঁদের শব্দ চয়ন, বাচনভঙ্গি, উপস্থাপনা ও গুরুত্ব-emphasis-প্রদানের তারতম্য। আমরা তো সঙ্গতভাবেই আশা করতে পারি যে, এঁদের চিন্তা-চেতনায় শুধু অতীত ও বর্তমানই গুরুত্ব পাবে না বরং একটা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নও তাঁরা দেখবেন। কিন্তু বাস্তবে কি তা ঘটেছে? বরং দেখা যাচ্ছে, তাঁদের রিপোর্টে ফুটে উঠেছে সমকালীন সমাজ রাজনীতির একটা প্রতিচ্ছবি। প্রথম কমিশন চেয়েছেন ভাল পাকিস্তানী গড়তে। দ্বিতীয় কমিশন শ্রেণী সংগ্রামে আস্থাবান। আর তাই তাঁরা চেয়েছেন কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সমাজকে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করতে। তৃতীয় কমিশন অবশ্য চেয়েছেন আদর্শ মানুষ তৈরি করতে, যাদের মধ্যে থাকবে নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ। কবি গুরুর সেই 'মুগ্ধ জননীর' 'সাত কোটি সন্তান'কে তাঁরা শুধু 'বাঙ্গালী' করে স্বস্তি বোধ করেননি বরং তাদেরকে 'মানুষ' করার কঠিন সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। কোন্ সুপারিশমালা তাহলে আমাদের কাছে বেশি গ্রহণীয় হওয়া উচিত?

এই প্রসঙ্গে আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে Oxford Centre for Islamic Studies-এ ১৯৯৩ সালে প্রদত্ত সেন্টারের পেট্রন H.R.H. The Prince of Wales-এর সেই বহুল আলোচিত বক্তৃতাটি যেখানে তিনি পাশ্চাত্যের বর্তমান অন্ধ ইহজাগতিকতা, স্বার্থসর্বস্ব বস্তুবাদ, ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের পেছনে বিরামহীন ছোটাছুটি এবং প্রকৃতিকে পদানত করে ফেরআউনী স্বেচ্ছাচারিতার লাগামহীন প্রতিযোগিতায় শ্রান্ত, ক্লান্ত ও খণ্ডিত জীবনের অধিকারী হতাশ মানবগোষ্ঠীর করুণ কাহিনী তুলে ধরেছেন। একটু দীর্ঘ হলেও এখানে তাঁর বক্তৃতা থেকে আমি কিছুটা উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ

"More than this, Islam can teach us today a way of understanding and living in the world which Christianity itself is the-poorer for having lost. At the heart of Islam is its preservation of an integral view of the Universe. Islam-like Buddhism and Hinduism-refuses to separate man and nature, religion and science, mind and matter, and has preserved a metaphysical and unified view of ourselves and the world around us. At the core of Christianity there still liesan integral view of the sanctity of the world, and clear sense of the trusteeship and responsibility given to us for our natural surroundings.

* * *

But the West gradually, lost this integrated vision of the world with Copernicus and Descartes and the coming of the scientific revolution A comprehensive philosophy of nature is no longer part of our everyday beliefs. I cannot help feeling that, if we could now only rediscover that earlier, all embracing approach to the world around us, to see and undestand its deeper meaning, we could begin to get away from the increasing tendency in the West to live on the surface of our surroundings, where we study our world in order to manipulate and dominate it, turning harmony and beauty into disequilibrium and chaos."

আমি এবারে আপনাদের মনোযোগ একটি সাংবিধানিক সমস্যার প্রতি আকর্ষণ করছি। বন্ধুবর অধ্যাপক শামসুল হক তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিসমিল্লাহতে- তিনি আরবীতে বিসমিল্লাহ পড়বেন, না কি বাংলা তরজমাতে সে নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি বলতে চাইছি, তিনি বিসমিল্লাহতে- অর্থাৎ শুরুতেই যে সমস্যার সম্মুখীন হবেন, তার সমাধান তিনি কিভাবে করবেন? কুদরাত-এ-খুদা কমিশন তার যে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিলো তার তো আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান যে সংবিধানের "প্রাধান্য অক্ষুন্ন" রাখতে এবং "ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান" মহামান্য রাষ্ট্রপতি হতে শুরু করে দেশের কনিষ্ঠতম নাগরিকের "পবিত্র কর্তব্য" (সংবিধান ঃ প্রস্তাবনা) এবং "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত আসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।" (সংবিধান। প্রজাতন্ত্র ঃ ধারা ৭ (২) অনুযায়ী ইসলাম প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম। "The state religion of the Republic is Islam" (সংবিধান ঃ প্রজাতন্ত্র ঃ ধারা ২ (ক)। সেক্যুলারিজম এখন প্রজাতন্ত্রের মূলনীতি নয় বরং সংবিধানের বর্তমান বিধান হলো ঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি" (সংবিধান ঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঃ ধারা ৮ উপধারা (১) ও (১ক)। এমতাবস্থায় মুসলিম শিশুদের প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অংক, তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত এবং চিত্রাঙ্কন পাঠ্য তালিকাভুক্ত হলেও কুরআনের বর্ণমালার সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে না অর্থাৎ ইসলামের অনুশাসন মত সাত/দশ বছর থেকে তাদের নামায পড়ার পথে বাধা আরোপ করা হবে। এটা কি, সংবিধান সম্মত, সমীচীন, এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মানুভূতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কালচার সম্মত হবে? প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে একজন মুসলিম শিশু কেন কায়দা/আমপারা পড়তে পারবে না তার কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি আমি খুঁজে পাই না। যাঁরা কচি বয়সে তাঁদের ছেলেমেয়েদের দ্বিতীয় ভাষা শেখার ব্যাপারে আপত্তি তুলে থাকেন তাঁদেরই ছেলেমেয়েরা আবার অভিজাত পল্লীতে অবস্থিত বিদেশী কেতায় পরিচালিত কিণ্ডারগার্টেন বা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা শেখার আগেই ইংরেজিতে বেশ দক্ষতা অর্জন

করে বসে। এই মানসিকতার অবসান যত দ্রুত হয় দেশের জন্য ততই মঙ্গল। বোধ করি এখন শরৎ সাহিত্য পড়ার রেওয়াজ বড় একটা নেই। নইলে অতি প্রগতিবাদী আমাদের এই বন্ধুদের পরামর্শ দিতাম শরৎ চন্দ্রের 'নব বিধান' টা আর একবার পড়তে।

আমি বরং এক ধাপ এগিয়ে যেতে চাই। আমাদের সমাজটাকে আমরা আর কতকাল খণ্ডিত ও বিখণ্ডিত করে রাখব? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত আর কত বিভাজন থাকবে? একদিন বিদেশী শাসকদের উসকানি ও প্ররোচনায় স্কুল ও মাদ্রাসার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল তার কি অবসান ঘটান যায় না? মাদ্রাসাগুলোর কোর্সে বহুল পরিবর্ধন সাধন করা হয়েছে। দাখিল ও আলিম পর্যায় পর্যন্ত ইংরেজি, বাংলা, অংক ও অন্যান্য বিষয়ে অভিন্ন কোর্স অনুসরণ করা হচ্ছে। মাদ্রাসা থেকে সরাসরি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রকৌশল কোর্সে যোগদান করা যাচ্ছে বাকী রয়েছে ফাজিল ও কামিল কোর্সের যথার্থ মূল্যায়ন ও সমতা বিধান। এ কাজটিতে হাত দিতে হবে অত্যন্ত সতর্কতা ও ঐকান্তিকতার সাথে। সমতা বিধান করতে গিয়ে আমরা যেন মাদ্রাসা শিক্ষার মৌল বৈশিষ্ট্যকেই শেষ করে না দিই। ইংরেজ মিশনারীদের বাড়াবাড়িতে একদিন কেন মুসলিম অভিভাবকরা উক্ত ইংরেজি বিদ্যালয় বর্জন করেছিলেন কিংবা আমাদের পিতৃ পুরুষরা ওয়ারেন হেস্টিংসে প্রবর্তিত মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা নাকচ করে দিয়ে তাঁদের নিজস্ব কওমী বা খারেজী মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন তার নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করে অতি সর্তকতার সাথে এই স্পর্শকাতর বিষয়টির মীমাংসা করতে হবে। প্রায়বিলুপ্ত টোল শিক্ষার সাথে একই বন্ধনীতে দেড় পাতায় মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কিত সকল বিষয়কে বন্দী করে কলমের এক খোঁচায় মাদ্রাসা ব্যবস্থাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। এরূপ উদ্যোগ গ্রহণ চরম অদূরদর্শিতার পরিচায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

আমি যে প্রস্তাবটি এখানে করতে চাই তা হলো প্রাথমিক পর্যায়ে সকল শিশুদের জন্য একটি অভিন্ন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তন। একটা স্বাধীন, ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নির্ধারণের পূর্ণ এখতিয়ার একমাত্র আমাদের। কোন দেশ-প্রাচ্য বা প্রতীচ্য-এর অন্ধ অনুসরণ যেমন আমরা করব না তেমনি অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কিছু গ্রহণ করব না এমন অহেতুক জিদও আমাদের থাকবে না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের অধিকাংশ নাগরিকদের অভিপ্রায় অনুযায়ী আমাদেরই ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয় চরিত্রের পরিপূরক হবে। জাতীয় চিন্তা থেকে তা উৎসারিত হবে এবং জাতীয় চেতনাকে আবার তা সমৃদ্ধ ও সতেজ করবে। Adam's রিপোর্ট থেকে আমরা জানি আমাদের দেশে লেখাপড়ার ঐতিহ্য ছিল কি সুমহান এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল কত গভীর ও পবিত্র। আমরা আরও জানি যে এদেশের শতকরা ৮৭ জন নাগরিক যে মহান ধর্মে বিশ্বাস করে এবং গভীরভাবে বিশ্বাস করে-তাঁদের রসূল (সা) প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জ্ঞানার্জন ফরয করে দিয়েছেন। তার চেয়েও বড় ও গর্বের কথা হলো রসূল (সা) তাঁর প্রভুর কাছ থেকে প্রথম যে প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন তাতে ঈমান ও ইসলাম বা সালাত ও সাওমের কথা বলা হয়নি বরং নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ "পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে 'আলাক' হইতে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে যাহা সে জানিত না" (আল-কুরআন ৯৬ ঃ ১-৫)। আমার প্রায়ই মনে হয়, যে মহান প্রভু সপ্তম শতাব্দীতে যখন বিজ্ঞান সম্পর্কে এমনকি পণ্ডিতদের জ্ঞান ছিল খুবই সীমাবদ্ধ বিশেষ করে ভ্রূণবিদ্যা (Embryology) সম্পর্কে বলতে গেলে তাঁরা কিছুই জানতেন না, তখন মাতৃ জরায়ুতে এঁটে থাকা নিষিক্ত ডিম্বকোষ 'আলাক' থেকে মানুষের জন্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি কি তাঁর রাসূল (সা)-এর

কাছে প্রেরিত ঐ পঞ্চ আয়াতে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের একটা ইঙ্গিত দেননি? আয়াত পাঁচটি আমরা আবার যদি মনোযোগের সাথে পাঠ করি তাহলে কি আমাদের মনে হবে না যে মহাজ্ঞানী মহান রাব্বুল আলামীন চাইছেন যে আমরা নরনারী নির্বিশেষে সকলে জানি ঃ

(ক) তিনি আমাদের মহিমান্বিত প্রভু ও প্রতিপালক;

(খ) জানি তাঁর মহান সৃষ্টিকে এবং সে সৃষ্টিতে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তু (মানুষসহ) এর অবস্থিতি, পরিবেশ ও পরিণতি;

(গ) জানি পড়তে, লিখতে এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে; এবং (ঘ) জানি জানার মাধ্যমে অজানাকে।

তা-ই যদি হয়, তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কোন পর্যায়েই তাঁকে আমরা দূরে রাখতে পারি না। তিনি থাকবেন আমাদের চিন্তা ও কর্মে সদা বর্তমান। আর সে কারণেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুন্দর ও সুসামঞ্জস্য মিলন ঘটবে mind ও matter, দীন ও দুনিয়া, মানুষ ও তার পরিবেশ এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের। আমি তাই মনে করি অধুনালুপ্ত মাওলানা আবু নসর ওয়াহিদ প্রবর্তিত নিউস্কীম মাদরাসার ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাস আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তারই আদলে আমরা একটা জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি। ধর্ম শিক্ষা ও ধর্মবহির্ভূত (?) শিক্ষাকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করতে আমি প্রস্তুত নই। তবু পরিসংখ্যানের প্রয়োজনে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র যে কুদরাত-এ-খুদা কমিশন কর্তৃক পরিচালিত জরিপে ১৯৫১ জন উত্তরদাতা (প্রায় দুই তৃতীয়াংশ) মত প্রকাশ করেছিলেন যে ধর্মশিক্ষা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত। এই পর্যায়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর উপরে আমি সমধিক গুরুত্ব একজন্য আরোপ করছি যে এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম সোপান এবং এই পর্যায় থেকে অধিকাংশ নাগরিক তাদের লেখাপড়া সমাপন করবেন। কাজেই এখানেই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ধর্মীয় চেতনা ও দেশপ্রেমে, পরিচিত করতে হবে দেশের মাটি ও মানুষের সাথে, অনুপ্রাণিত করতে হবে সত্যাশ্রয়ী, পরিশ্রমী, অধ্যাবসায়ী ও স্বনির্ভর হতে, গড়ে তুলতে হবে তাদের ব্যক্তিত্ব, জাগ্রত করতে হবে তাদের ঐক্যবোধ, সমাজপ্রীতি ও পারস্পরিক মমত্ব, তীক্ষ্ণ করতে হবে তাদের চিন্তাশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের দক্ষতা।

জাতীয় শিক্ষানীতি এমন একটি ব্যাপক বিষয় যে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণের স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমিও এই অসম্ভবকে সম্ভব করার নিষ্ফল প্রচেষ্টায় কাল-ক্ষেপণ করতে চাই না। বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

পূর্বেই বলেছি যে, আমি বর্তমানে প্রচলিত ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সমর্থন করি এবং ঐ সাথে কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের সাথে একমত পোষণ করি যে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। কমিশনের সাথে আমি আরও একমত যে মাধ্যমিক শিক্ষা হবে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। কলেজীয় শিক্ষার মেয়াদ হবে পাস ও অনার্স উভয় কোর্সের জন্য অন্তত পক্ষে তিন বছর। বর্তমানে প্রচলিত পাস ও অনার্স কোর্সের পার্থক্য দূর করে মেধা ভিত্তিতে অনার্স প্রদান (প্রকৌশল, কৃষি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত) করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আর সকল ক্ষেত্রেই মাস্টার্স কোর্সের মেয়াদ হবে দু'বছর।

প্রতি স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিষয়টি আমি সমর্থন করি। তবে ঐ সাথে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব অবশ্যই দিতে হবে। বস্তুতঃ ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের একটা জাতীয় নীতি থাকা বাঞ্ছনীয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই একটি আন্তর্জাতিক ভাষা আমাদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কারণে তা ইংরেজি- আয়ত্ব করতে হবে। ভাষাশিক্ষা পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

কমিশন বিজ্ঞান শিক্ষার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন আমি তা সর্বতোভাবে সমর্থন করি। কিন্তু ঐ সাথে আমি এ কথাও না বলে পারছি না যে, আমাদের দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজীয় এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়েও বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবেশ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বিজ্ঞানাগার, বিজ্ঞান গ্রন্থাগার, দক্ষ বিজ্ঞান শিক্ষক, কেমিক্যালস ইত্যাদির বড্ড অভাব। ঐ সাথে রয়েছে সিলেবাসের ভারসাম্যহীনতা। আজকাল গণিত, রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় নির্বাচিত না হয়ে অধিকাংশ কলেজে মনোবিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি তার স্থান দখল করেছে। H.S.C. বিজ্ঞানে গণিত অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। প্রতিটি পর্যায়ে বর্তমানে প্রচলিত সিলেবাসগুলির আশু মূল্যায়ন ও আবশ্যকীয় আধুনিকায়ন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সিলেবাস জীবন ও কর্মমুখী এবং দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সমন্বিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কমিশন দেশের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রভর্তির চাপ কমাতে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার কাজকে উৎসাহিত করতে দেশের তৎকালীন চারটি বিভাগে চারটি অনুমোদন দানকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছিলেন। তাদের আশা ছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিভুক্ত কলেজসমূহে "ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিযুক্তি, পরীক্ষা পরিচালনা এবং তাদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ" করবে। চার বিভাগে চারটি অনুমোদন দানকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি তবে গাজীপুরে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে দেশের অন্যান্য স্থানে বহিঃ ক্যাম্পাস স্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতোমধ্যেই তাদের কাজ শুরু করেছে এবং অধিভুক্তি, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রভর্তি, কলেজ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু তৎপরতার স্বাক্ষর রেখেছে। তবে অতি সম্প্রতি স্থানীয় চাহিদার চাপে এমন কিছু কলেজকে সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধিভুক্তি দান করা হয়েছে যে গুলোতে মান অনুযায়ী পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষক নেই বা তাদের গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞানাগারগুলোও মানসম্মত নয়। আরো শোনা যায় যে, শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য নির্মিত ভবনটি 'হাইজ্যাক' হতে চলেছে। অপর পক্ষে কলেজ পরিচালনার বিষয়ে মন্ত্রণালয় তাদের কর্তৃত্ব ও মুঠো শিথিল করতে আদৌ প্রস্তুত নন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও সরকারের পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার সংজ্ঞায়িত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী বা রাষ্ট্রীয়করণ আমাদের দেশে একটা *craze* এ পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতাপূর্ব কালে আমাদের দেশে সরকারী কলেজের সংখ্যা ছিল ৮ (আট), ১৯৭৪ এ ছিল ৩৪ এবং এখন এই সংখ্যা দু'শ ছাড়িয়ে গেছে। মজার কথা হলো এই সব সরকারী কলেজের কোন কোনটিতে ইংরেজি শিক্ষকের একটি পদও নেই। আবার কোনটিতে কোন কোন বিষয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা হলো ৪ (চার) আর তারা কোর্স নিচ্ছেন পাস, অনার্স, স্নাতকোত্তর (প্রথম) ও স্নাতকোত্তর (শেষ) পর্বে। তা হলে লেখাপড়া কেমন হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা আপনারা করতে পারেন। এগুলির কোন কোনটিতে এমনকি উল্লেখ করার মত একটি গ্রন্থাগারও নেই। অথচ সরকারীকরণের মাধ্যমে শিক্ষকবৃন্দ অফিসার

তথা আমলা হয়ে গেছেন এবং স্থানীয় গভর্নিং বডির কাছে জবাবদিহিতার আপদ থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। আজকাল প্রাথমিক পর্যায় থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং সমাজও তাদের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে চাইছে। কিন্তু তা কি তারা পারছেন? ছাত্র পরিষদ, তাদের দাবী দাওয়া, প্রশাসনে তাদের হস্তক্ষেপ, ভর্তি ও পাস ফেইলের ব্যাপারে তাদের আব্দার এবং দাবীদাওয়া পূরণে সামান্য গোলমাল হলে এডওয়ার্ড সরকারী কলেজ পাবনার ভাগ্যহত অধ্যক্ষের সপরিবারে নিগৃহীত হবার ঘটনা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ওরই মধ্যে ঢাকাস্থ সিটি, কমার্স বা নটরডাম কলেজের মত বেসরকারী কলেজে আইন ও শৃঙ্খলা কিভাবে রক্ষিত হচ্ছে তা কি ভেবে দেখার ব্যাপার নয়? জগন্নাথ কলেজে (না কি বিশ্ববিদ্যালয়) কোন বিভাগে কত ছেলে মেয়ে ভর্তি হয়েছে তার হিসেবই কি চট করে দেওয়া যাবে? ইত্যাকার বিষয়গুলো শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করবে। ছাত্রছাত্রীদের অধিকারের একটা সীমারেখা বেধে দেওয়ার সময় এসেছে। সমাজে অস্থিরতা, রাজনীতিতে হট্টগোল, অর্থনীতিতে বন্ধ্যাত্বের দোহাই দিয়ে আর কতদিন আমরা ক্যাম্পাস দৌরাত্ম্য সহ্য করব? এখনও কি ফিরে দাঁড়ানোর সময় হয়নি?

নিজে সারা জীবন শিক্ষকতা করে আজ জীবন সায়াহ্নে বড্ড লজ্জা ও ক্ষোভের সাথে স্বীকার করছি যে, আমাদের অনেকের শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করা ঠিক হয়নি। কিন্তু যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন সমাজ তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দিয়েছে কি? অতীতে আমরা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষককে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করতাম এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তার সহকর্মী, ছাত্র বা বৃহত্তর সমাজ থেকে তা কি পান? যদি না পান তা হলে তার কারণ নির্ণয় করতে হবে এবং এ পেশাতে তাদেরই প্রবেশাধিকার থাকা উচিত যারা স্বীয় মেধা, যোগ্যতা, গবেষণাকর্ম, পাঠদানে কুশলতা ও আদর্শ নিষ্ঠায় সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করতে পারবেন। ঐ সাথে সমাজকেও সেই আদর্শ শিক্ষকের যথার্থ কদর করতে ও যোগ্য প্রতিদান দিতে হবে।

[সেন্টার-ফর পলিসি স্টাডিজ কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত এবং 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা' শীর্ষক গ্রন্থ হতে গৃহীত]

"যে প্রশ্নের সমাধান রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীসে পাওয়া যাবে তার বিরুদ্ধে কোন সাহাবা, তাবেঈ, ইমাম ও মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত আহলে-হাদীসগণ অনুসরণ করবে না।"

—আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রা.)

সভ্যতার চ্যালেঞ্জ মুকাবেলায় মুসলিম ঐক্য ও সংহতি

এ.কে.এম. শামসুল আলম*

ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহ। ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ। আম্মাবা'দ

মুসলিম উম্মাহ সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী তাহ্‌যীব, তামাদ্দুন ও ইসলামের অনুশাসন যথাযথ ভাবে মেনে চলে। ঐ সময় মুসলমানরা উন্নতি, অগ্রগতি ও ঐতিহ্যের স্বর্ণ শিখরে অবস্থান করছিলেন ফলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি মুতাবেক তারা খেলাফতের যোগ্য হকদার ছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল ইয্‌যত এ সম্বন্ধে ঘোষণা করেছেন ঃ

وعد الله الذين ءامنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم

وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر

بعد ذلك فأولئك هم الفسقون (النور : ٥٥)

(তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেনই; যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন যারা আমার ইবাদত করবে আমার কোন শরীক করবে না। অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা সত্যত্যাগী; সূরা নূর ঃ ৫৫)

ইসলাম দ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের বহু মানুষের মন-মস্তিষ্ক খুলে যায়। রাসূলের বাণী বাস্তবরূপ লাভ করে। আল্লাহর রাসূল ইরশাদ ফরমান ঃ

"সমগ্র দুনিয়াকে একটি বড় ঘর আকারে আমার কাছে তুলে ধরা হয়। আমি এর পূর্ব ও পশ্চিমের দিগন্ত প্রত্যক্ষ করি। অচিরেই সর্বত্রই আমার উম্মত পৌঁছে যাবে। আমাকে দুটো খনির মালিকানা দান করা হয়। একটি হলুদ রং-এর অপরটি লাল রং-এর।" (তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান ঃ হাদীস নম্বর-২১৭৬)

মুসলিম মিল্লাত তাদের সোনালী যুগে মর্যাদার শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। তারা এমন এক সভ্যতার ধারক ছিলেন, যার ভিত ছিল অত্যন্ত মযবুত এবং পূর্ণাঙ্গ। এ সভ্যতা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। এর খ্যাতি ছিল জগৎ জোড়া।

পরবর্তী কালে মুসলমানরা নানা কারণে পশ্চাদমুখী হয়ে পড়ে। তাদের পতন তাদেরকে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়। তারা ব্যক্তি স্বার্থের বশবর্তী হয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। সুতরাং তারা চিন্তা চেতনা ও মননশীলতার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ে। শক্তিশালী এই জাতি অল্পদিনেই দুর্বল জাতিতে

* কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিণত হয়। শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত এই জাতি একেবারেই মুর্খতায় পর্যবসিত হয়। এরা সম্পদহীনে পরিণত হয় অথচ এদের মধ্যে যাকাত গ্রহণ করার লোক পাওয়া যেত না। সর্বোপরি এদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয় অথচ এদের ঐক্য ছিল সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় দৃঢ় ও মযবুত। মুসলমানদের ঐক্যের পাহাড়ে এমন ধস নামে যে তা আর মেরামত করা সম্ভব হয়নি। তবে এ ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রচেষ্টা, আত্মত্যাগ ও কুরবানীর প্রয়োজন। মুসলমানরা একটু তৎপর হলে আল্লাহর মদদ, সুনিশ্চিত। 'নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব ওয়া বাশশিরিল মু'মেনীন।'

ঐক্য ও এর তাৎপর্য

আরবী ভাষায় وحدة, বা اتحاد শব্দের অর্থ ঃ ঐক্য। দুই বা ততোধিক বস্তুর এক বস্তুতে পরিণত হওয়ার নাম اتحاد রাজনৈতিক পরিভাষায় দুই বা ততোধিক জাতির একই আদর্শে একিভূত হওয়া, তাদের পররাষ্ট্র নীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি ও সমাজনীতি সকল দিক দিয়ে তাদের এক ও অভিন্ন জাতিত্বে পরিণত হওয়ার নামই ঐক্য ও সংহতি। মুসলিম জাহানের অন্তর্ভূক্ত দেশসমূহ চিন্তা-চেতনায়, রাজনীতি সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভিন্ন ফর্মূলা পেশ করে একটা শক্তিশালী মুসলিম বিশ্ব গড়ে তুলবে এটাই মুসলিম ঐক্যের লক্ষ্য ও তাৎপর্য।

ঐক্যের উপাদান সমূহ ঃ

মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি জোরদার করার লক্ষ্যে ঐক্যের মূল উপাদান সমূহ কি তা আগে শনাক্ত করতে হবে।

প্রথম উপাদান ঃ এ সব উপাদনের মধ্যে চিন্তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। চিন্তার জন্য মন এবং বিবেক উভয়েরই প্রয়োজন। কেননা মনের সাথে রয়েছে ঈমানের সম্পর্ক এবং বিবেকের সাথে রয়েছে চিন্তা তথা ইলমের সংশিষ্টতা।

দ্বিতীয় উপাদান-সমাজ ও জনপদ ঃ ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র ও সমাজ এর মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক জোরদার করে একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অভিন্ন রীতি নীতি অনুসরণ করার নাম সামাজিক ঐক্য।

তৃতীয় উপাদান-রাষ্ট্র ঃ একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সকল মানুষ দেশ রক্ষার স্বার্থে অভিন্ন লক্ষে ঐক্যমত পোষণ করাকে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বলা যেতে পারে।

চতুর্থ উপাদান-অর্থনৈতিক ঐক্য ঃ অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রণীত নিয়মাবলীর সংগে সংশ্লিষ্ট নিয়মনীতিতে ঐকমত্য পোষণ।

উপরোল্লিখিত বিষয়াদি যদি কোন জাতির মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে বলা যায় এই জাতি ঐক্যবদ্ধ। এসব গুণাবলী না থাকলে ঐক্য অর্জিত হয় না।

যদি কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকজনের ভাষা একাধিক হয়, রীতি নীতি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাদের আচার অনুষ্ঠান, চিন্তা ভাবনার মধ্যেও বিভিন্নতা থাকে আর রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও রীতি-নীতিতে পূর্ণ ইনসাফের ছাপ থাকে তাহলেও ঐ জাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় হতে পারে। তবে শাসকদের হতে হবে আমানতদার ও দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী তাহলে সকল বাধা বিপত্তি দূরীভূত হওয়া সহজতর হবে।

শরী'আতের দৃষ্টিতে ঐক্য ঃ

ইসলামী অনুশাসন চালু থাকলে এবং শাসকবর্গ মুসলমানদের স্বার্থ বাস্তবায়নে তৎপর হলে তো ঐক্য ও সংহতির ব্যাপারে কোন সংশয়ই থাকতে পারে না।

মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে সংহতি জোরদার ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য। প্রতিটি মুসলমানের মনের

ঐকান্তিক কামনাও তাই। এজন্য ইসলামে ঐক্যের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী শরী'য়তে ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং অনৈক্যের পাহাড় ভেংগে চুরমার করার তাগিদ পবিত্র কুরআনে এসেছেঃ

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . آل عمران : ١٠٣

(এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না; আলে ইমরান ঃ ১০৩)

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রাসূল ইরশাদ ফরমিয়েছেনঃ

إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا . وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا . . . . وأن تنصحوا من ولاه الله امركم ويكره لكم قيل وقال و اضاعة المال وكثرة السوال .

مسلم . الرقم : ١٣٤٠

(নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন। অতঃপর যে তিনটি বিষয় পছন্দ করেন তা হল তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে। তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার মনে করবে না। আল্লাহর রশিকে দৃঢ়তার সংগে সম্মিলিতভাবে ধারণ করবে, দলে উপদলে বিভক্ত হবে না। আর তোমাদের শাসক বৃন্দকে সদুপদেশ দিবে। আল্লাহ অপছন্দ করেন ঃ পরচর্চা, অধিক প্রশ্ন এবং সম্পদ অপচয়; মুসলিম ঃ ১৩৪০)

অনৈক্যের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, জামা'আতবদ্ধ যিন্দেগীর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একলা চলো নীতি বর্জনের তাগিদ এসেছে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية . مسلم كتاب الفتن رقم الحديث : ٥٣

(যে ব্যক্তি আনুগত্য পরিত্যাগ করে এবং সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। (সহীহ মুসলিম কিতাবুল ফিতান হাদীস নম্বর ঃ ৫৩)

অপর হাদীস ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . . يدالله مع الجماعة ومن شذ شذ فى النار - الترمذى رقم الحديث : ٢١٦٧

(জামা'আতবদ্ধতার উপর আল্লাহর রহমত রয়েছে, যে পৃথক হবে সে পৃথক ভাবেই দোযখী হবে; তিরমিযী ঃ ২১৬৭)

দ্বীনী ভ্রাতৃত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব ও তাগিদ এসেছে কুরআনে। আল্লাহ বলেন ঃ انما المؤمنون اخوة

(মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই .... হুজুরাত ঃ ১০)

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره - (متفق عليه) صحيح البخارى، كتاب المظالم، الباب : ٣ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، الحديث رقم : ٣٢

(আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাক। মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তাকে যুলম করতে পারে না, হীন জ্ঞান করতে পারে না এবং অপমান অপদস্থও করতে পারে না ... বুখারী, কিতাবুল মাযালিম মুসলিম কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ।)

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ...

(মু'মিনের উদাহরণ পারস্পারিক ভালবাসায়, সহমর্মিতায় ও আন্তরিকতায় একটি দেহ সদৃশ ... যার একটি অংগে আঘাত লাগলে সম্পূর্ণ শরীর আক্রান্ত হয়ে জ্বর ও ব্যথায় কাতরায়।)

রাসূল (সা) আরও বলেন:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم اصابعه (صحيح البخاري، كتاب الصلاة)

(মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য মজবুত ভিত্তি স্বরূপ একজন অন্যকে শক্তিশালী করে। রাসূল (সা) স্বীয় অংগুলিকে অংগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখান উদাহরণ স্বরূপ ঃ সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত।)

মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইয়ের হক আদায়কে ফরয মনে করে। ফলে মুসলমানদের পারস্পারিক সৌহার্দ, ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর সব মুসলমান যেন একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সদস্য-যাদের সবার একে অপরের প্রতি দায় দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে।

এসব কারণে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ।

ঐক্যের ভিত্তি সমূহ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই পতাকার নীচে কোন কোন জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কতিপয় বিষয়ে ঐকমত্যের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন। আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব এই সব ঐকমত্যের ভিত সবসময় সুদৃঢ় থাকে না। ঐক্যের মানব রচিত ভিত সমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াদি উল্লেখযোগ্য ঃ

১. জাতীয়তাবাদ ২. দেশপ্রেম বা জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণ ৩. বর্ণবাদ ৪. ভাষা প্রভৃতি।

জাহেলী যুগের লোকেরাও ঐক্যের জন্য এসব বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। হ্যাঁ, উপরোক্ত বিষয়গুলো ঐক্যের ভিত বটে, বহু জাতি এসব ভিতকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধও হয়েছে তবে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন মানব জাতির পতনের জন্যও ঐসব জিনিষই দায়ী যা ঐক্যের জন্য ভিত হিসেবে বিবেচিত। বিষয়টি একটু সহজ করে এভাবে বলা যায় ঃ

পৃথিবীতে বহু অঘটন বা বিপত্তি আছে, যার মধ্যে চমকে উঠার মত বড় বিপদের ইংগীত হলো পৃথিবীবাসী লক্ষ লক্ষ দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ মতাদর্শে বিশ্বাস করে থাকেন। এসকল পরস্পর বিরোধী জনগোষ্ঠী ধ্বংস হতে প্রস্তুত কিন্তু তারা তাদের মতাদর্শের পরিবর্তনে রাজী না। এক জাতি অন্য জাতিতে কিরূপে পরিণত হবে? একদেশ অন্য দেশে রূপান্তরিত হবেই বা কেন? এক জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অন্য জাতির জন্য কি প্রযোজ্য হতে পারে? সুতরাং জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদের ভিত এতই শক্ত যে তার রদবদল প্রায়ই অসম্ভব।

ফলকথা জাতীয়তাবাদের বর্তমান প্রবক্তাগণ স্বজনপ্রীতি ও গোত্রপ্রীতির ধুঁয়া তুলে বৃহত্তর ঐক্যের লক্ষ্যে একাধিক জাতির মধ্যে সমন্বয় করার নীতিতে বিশ্বাসী নন। বর্তমানে জাতিতে জাতিতে বিরোধ, একে অপরের উপর কর্তৃত্ব করার স্পৃহা এমন কি একদেশ অন্য-দেশের অস্তিত্ব ও মানচিত্র মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত। এজন্য সারা দুনিয়ায় অস্থিরতা, আহাজারি লেগেই আছে। অশান্তি, অস্থিরতা ও অন্যায়ের মূলে রয়েছে মানব রচিত এ সকল মতবাদ যা সভ্যতার চরম উৎকর্ষ লাভকারী বর্তমান পৃথিবীর জন্যে

বর্তমানে হয়ে উঠেছে হুমকীর কারণ। পৃথিবীর নিরাপত্তা ও শান্তি দূরীভূত হওয়ার কারণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الروم : ٤١

(মানুষের কৃত কর্মের দরুণ সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করিয়ে থাকেন। যাতে তারা ফিরে আসে; রূম ঃ ৪১)

ইসলামী ঐক্যের ভিত্তি সমূহ

ইসলাম ঐক্যের জন্য মযবুত ভিত রচনা করেছে। ইসলামী ঐক্য একবার গড়ে উঠলে এর ভিত প্রকম্পিত করার মত আর কোন শক্তি নেই। কোন কারণে তা দুর্বলও হয় না। ইসলাম ঐক্যের জন্য যে সব উপাদানকে মূল ভিত মনে করে তার পুরোভাগে রয়েছে ঃ

১. ইসলামী আক্বীদাহ ঃ

কিতাব সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে ইসলামী আক্বীদার ইস্পাত কঠিন ভিত রচিত। মুসলিম মিল্লাতের সোনালী যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা ইসলামী আক্বীদার দীক্ষা দিয়ে গেছেন এবং এর বাস্তব প্রয়োগ নিজেদের চরিত্র ও ধ্যান ধারণায় দেখিয়েছেন। ইসলামী আক্বীদার মধ্যে পরবর্তী যুগে ক্ষেত্র বিশেষে বিদআত যুক্ত হয়েছে। দর্শন শাস্ত্রের কোন কোন পন্ডিতের সৌজন্যে তাওহীদ ও ঈমানের সংগে বেশ কিছু বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এছাড়া তথাকথিত ভন্ড সূফী ও তাদের অনুসারীদের মাধ্যমে নতুন নতুন রীতি-নীতি রসম-রেওয়াজের আমদানী ঘটেছে। ফকীর, দরবেশ, বাউল জটাধারীদের অপচেষ্টায় ইসলামের নামে কিছু জঞ্জাল মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়েছে। অবশেষে ধর্মহীন বাতিলপন্থীরাও ইসলামের কোন কোন দিকের ভুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে। প্রকৃত ঈমানদারগণ একটু তৎপর হলে এবং সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা হলে এসব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

সঠিক আক্বীদা মুসলিমের সবচে মূল্যবান রত্ন। আক্বীদা মু'মিনের স্বদেশ। মুসলমানরা একে অপরের সংগে মিলিত হয় আক্বীদার টানেই, সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবনের ভিত্তিই হল ইসলামী আক্বীদা। আল্লাহ ইরশাদ ফরমান ঃ

ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون . الانبياء – ٩٢

(এই যে তোমাদের জাতি- ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তো তোমাদের প্রতিপালক অতএব আমার ইবাদত কর; আম্বিয়া ঃ ৯২)

ইমাম তাবারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আল্লাহ বলছেন হে পৃথিবীর মানুষ! তোমরা বহু ঈশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করে একমাত্র তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর আর তোমরা মূলতঃ সকলেই এক জাতি মানবজাতি। (জামেউল বায়ান ১/৮৫)

২. ইবাদত ঃ

শরী'আতে ইবাদতের যে সমস্ত প্রতীক রয়েছে যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, ভাল কাজের আদেশ মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং জিহাদ এ সব কিছুতেই মুসলমানরা পরস্পর পরস্পরের সংগে মেলামেশার সুযোগ পায়। ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতির কাঠামো জোরদার করা। শরী'আতে জামা'আতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মসজিদ-ই হল সালাত অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোত্তম স্থান।

সিয়ামও মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য সংহতি জোরদারের এক বড় প্রতীক। সারা বিশ্বের মুসলমান ফজর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়াম সাধনায় মশগুল থাকেন এখানে কোন মুসলিম স্বীয় খেয়াল-খুশী মত সাহরী ও ইফতারের নিজস্ব সময় নির্দ্ধারণে ব্রত হয় না।

হজ্জ ঃ সভা-সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের মধ্য দিয়েই হজ্জের মানাসিক আদায় করা হয়। হজ্জের এই মহা মিলনে দুনিয়ার সকল অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি আসেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর ইরশাদ হল ঃ

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات ـ (الحج ٢٨)

(এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা দাও। তারা তোমাদের নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্ব প্রকার উষ্ট্রের পিঠে (যান বাহনে), তারা আসবে দূর দূরান্ত পথ অতিক্রম করে; হাজ্জ ঃ ২৭-২৮)

৩. ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন ঃ

ঐক্যের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শরী'আতের আইন। ইতিপূর্বে আলোচিত ঐক্যের সব গুলো উপাদানই ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা জামা'আতবদ্ধভাবে বাস্তবায়ন করা হতে পারে যদি কোন দেশে শরী'আতের সংবিধিবদ্ধ আইন থাকে যে ঐক্য পরিপন্থী কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ভাবে দোষণীয় তাহলে ঐক্য অর্জন আরও সহজতর হবে। অপর পক্ষে দেশে শরী'আত পরিপন্থী আইন চালু থাকলে ঐক্যের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, ঐক্য প্রতিষ্ঠাও হয়ে উঠবে দুঃসাধ্য। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ঘোষণা করেন ঃ

ولا يشرك في حكمه احدا, (তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না; সূরা কাহফ ঃ ২৬)

৪. একজনের নেতৃত্ব

মুসলমানদের নেতা হবেন একজন। একজনের নেতৃত্বে দুনিয়ার সকল মুসলমান নিয়ন্ত্রিত হবে। একই সময় একাধিক নেতা হওয়া বৈধ নয়। হাদীসে বলা হয়েছে একই সময় দু'জন খলীফার শপথ নেয়া হলে দু'জনের পরবর্তী জনকে হত্যা কর।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারত-হাদীস নং ৬১)

ঐক্য অর্জনে বাধা সমূহ

মুসলিম জাহানে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বাধা বিপত্তি অনেক। এসব বাধা চিহ্নিত করে সেগুলো মুলোৎপাটনে তৎপর হতে হবে। বাধা সমূহ চিহ্নিত করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, যে সব পথে ঐক্য অর্জিত হবে তার প্রতিটি বাঁকে বাঁকে বাধা রয়েছে। এ গুলোর মুকাবিলার জন্য মুসলিম মিল্লাতের ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এসেছে। এক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. আদর্শিক মতপার্থক্য ও দ্বীনের প্রতি অনীহা ঃ

মতাদর্শিক পার্থক্য ইসলামী মতাদর্শ সমাজের প্রতিটি স্তরে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। আল্লাহর পথে আহ্বানের কথাই ধরা যাক; এক্ষেত্রেও বাধা প্রচুর। আল্লাহর পথে আহবানের পদ্ধতি ও পন্থা একাধিক। এক পন্থীয় বিশ্বাসীরা অন্য পন্থাকে সহ্য করতে পারেন না। পরস্পর বিরোধী এই সব পথ ও পন্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একই পদ্ধতির অনুসারী হতে হবে; তেমনি ভাবে আক্বীদা প্রচারের ক্ষেত্রেও বহু বাধা। খোদ সালাফী সংগঠন গুলোর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অপরিণামদর্শী কিছু লোক সালাফী হয়েও বহু ক্ষেত্রে বিদআত ও কুসংস্কারে লিপ্ত। বিদআত ও কুসংস্কার ছাড়াও মুসলমানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিরক এর সাথে জড়িত। আরও ভয়ানক অবস্থা তারা নিজেদের মুসলিম দাবী করে থাকেন অথচ তাদের

কাজ কর্ম সম্পূর্ণ ভাবে ইসলামী আচরণের পরিপন্থী। সালাফী দাবীদার হলেও বহুলোক সালাফী নিয়ম নীতির কট্টর বিরোধী এবং সালাফী পন্থার বিরোধিতায় তারা সম্ভাব্য সবই করতে প্রস্তুত।

মুসলমান ঘরের সন্তানরা অনেকেই অনৈসলামিক মতাদর্শ যেমন ঃ নাস্তিক্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ ইত্যাদির সমর্থক। শুধু কি তাই? তারা সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে নিজ নিজ বলয়ে এমনকি জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে ঐসব ভ্রান্ত মতবাদের বিস্তারে তৎপর। শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, প্রচার মাধ্যম, সাহিত্য, শিল্প সবখানেই তারা তাদের চিন্তা-চেতনার বিষাক্ত ছাপ ও প্রভাব বিস্তারে কার্পণ্য করে না।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়াদি এবং মনোবিজ্ঞান বা এ ধরনের কোন বিষয়কে তারা মনে করেন মানব সভ্যতার বড় আবিষ্কার, তাই তারা মৌলিক বিষয়াদি ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়াদির বিরোধীতা করে থাকেন এবং এই সবের প্রয়োজনীয়তা ও ফলাফল বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে থাকেন। আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক কোন বিদ্যার বিস্তারে, চিকিৎসা বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ইসলাম কখনই নিরুৎসাহিত করে না বরং মুসলমান বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, জাগতিক সব শিক্ষাই স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যের স্বরূপ উদঘাটনে সহায়ক। অপর দিকে অমুসলিম চক্রান্তের ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম কুরআনের ভাষা এবং ইসলাম বুঝার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম আরবী ভাষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে আরও একটি বড় বাধা হল তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম দেশ সমূহের কোথাও কোথাও আঞ্চলিক উপভাষা সমূহকে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়।

২. সামাজিক বাধা সমূহ ঃ

ঐক্যের সামাজিক লক্ষ্য সমূহের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো ঃ

ক. মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে ফেলা।

খ. জাহেলী প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা।

গ. মুসলিম ও ইসলামী সমাজের প্রতিটি সদস্যকে অমুসলিম ব্যক্তি ও সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা।

ঘ. সমাজের সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা।

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাধা সমূহ নিম্নরূপঃ

০ বিচ্ছিন্ন জাতীয়তাবাদ ঃ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বা স্বদেশ ও ভাষাগত জাতীয়বাদ সবই ইসলাম পূর্ব যুগের জাহেলী প্রথা। অথচ এ সকল তথাকথিত জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা অধিকাংশ মুসলিম অঞ্চলে চাপিয়ে দিবার অপচেষ্টা চলছে। এসব কারণে যুগে যুগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে।

০ জাহেলী প্রথা ও কুসংস্কার ঃ মুসলিম জাহানের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নানা ভাবে অনৈসলামিক কার্যকলাপকে ইসলামী বলে মনে করে থাকেন এটা সত্যই দুঃখজনক। এগুলো সামাজিক ও আদর্শিক জীবনের বহুক্ষেত্রে পরিবর্তনের মূল কারণ হয়ে থাকে।

০ বিজাতীয় প্রভাব ঃ বিদেশী ব্যক্তি ও সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব না হলে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। এটা কতকটা নাচ শিখতে গিয়ে হাঁটা ভুলে যাওয়ার মতই। বর্তমানে পৃথিবী আধুনিক টেকনোলজীর বদৌলতে একদেশ বরং একটি শহরের মত হয়ে পড়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যানবাহনের সহজলভ্যতার কারণেই এমনটি হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম এতই শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য

হয়েছে। আর তারাও যেন মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে। রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ফ্যাক্স ও ফোনের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে তাদের আগ্রাসন অব্যাহত গতিতে ধেয়ে আসছে। অপর পক্ষে মুসলিম মিল্লাতের সবত্রই আজ ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনের বড়ই অভাব। পশ্চিমা নগ্ন সভ্যতার প্রলয়ংকরী প্রভাবের ঢেউ আমাদের সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে আমাদের নিঃস্ব বানিয়ে চলেছে।

৩. রাজনৈতিক বাধা সমুহ ঃ

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথম দিক থেকেই মুসলিম মিল্লাতে দুঃখজনক ঘটনার অশুভ সূচনা হয়েছে। এক কেন্দ্রিক মুসলিম রাষ্ট্র অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়েছে ও হচ্ছে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থই মূলতঃ পারস্পারিক বিভক্তির কারণ। তাছাড়া কার্যকর কোন বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য যাতে গড়ে না উঠে সেজন্য শত্রুরা মাঝে মাঝে বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে মুসলিম মিল্লাতকে ধোকায় ফেলতে চায়। যেমন ঃ বিশ্বব্যাপী মুসলিম ঐক্য নয় বরং আঞ্চলিক ভাবে ছোট ছোট সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্য করা। এ প্রস্তাবে মুসলমানদের একাংশ খুশী। কিন্তু এটি একটি সদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ এতে কোন সন্দেহ নেই।

অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণা লালন করেন। তারা ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান লবীর পদলেহনে ব্যস্ত। জিহাদ যে দ্বীনের একটা চূড়ান্ত বিধান এ সম্পর্কে তাদের ধারণা অত্যন্ত লজ্জাকর। সুতরাং জিহাদ বাস্তবায়ন সবচে কঠিন সমস্যা সমূহের অন্যতম। কোন মুসলিম অঞ্চল এ ক্ষেত্রে অগ্রগামী হলে যেমন ঃ ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, চেচনিয়া, বসনীয়া, কসোভা প্রভৃতি অঞ্চলে জিহাদ সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের পথে হাজারো বাধা উপস্থিত হয়। আর বাধা খোদ মুসলিম শক্তির কাছ থেকেও আসবে এতে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই। সবচে দুঃখজনক ব্যাপার হলো অধিকাংশ মুসলিম দেশ এ ক্ষেত্রে নৈতিক সমর্থন দিতেও সাহসী হয় না।

৪. অর্থনৈতিক বাধা সমূহ ঃ

ঐক্যের ব্যাপারে বাধা সমূহের অন্যতম হল অর্থ সম্পদ। অর্থ সম্পদ একটি অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু বটে। যারা মনে করে এর প্রভাব গৌণ তারা ভুল করেন। সভ্যতার বিকাশে অর্থনীতি ও এর প্রভাব অস্বীকার করার সাহস কার আছে? ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প কারখানার গুরুত্ব অস্বীকার করার কি কোন উপায় আছে? এ সবই সভ্য জগতে অতি প্রয়োজনীয় ও স্বীকৃত বিষয়াদি। বর্তমান মুসলিম জাহানের মানচিত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সর্বত্র পশ্চাদপদ এবং অনুন্নতির ছাপ। এই অনুন্নত অঞ্চল সমূহের সাংকেতিক নাম তৃতীয় বিশ্ব। তৃতীয় বিশ্বে চ্যালেঞ্জের উল্লেখযোগ্য আলামত সমূহ হল ঃ

০ অধিকাংশ মুসলিম দেশে ক্ষুধা বিরাজ করছে।

০ অধিকাংশ মুসলিম দেশই বৈদেশিক ঋণের ভারে জর্জরিত। এ ঋণ কমার কোন লক্ষণ নেই বরং চক্রহারে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

০ কৃষি ও শিল্পখাতে তৃতীয় বিশ্ব পিছিয়ে পড়েছে।

৫. আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ঃ

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা) উম্মাতের বর্তমান ও ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ বিষয়ে যথাযথ অবহিত করে গেছেন। হযরত সাওবান হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন ঃ

يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قال : قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ ؟ قال : انتم يومئذ كثير .. ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم

ويجعل في قلوبكم الوهن، قال : قلنا : وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت (رواه الإمام أحمد في مسنده ٥/٢٧٨ واللفظ له، وأبو داؤد في سننه كتاب الملاحم الحديث رقم ٤٢٧٦)

(অচিরেই বিভিন্ন জাতির অপতৎতায় লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন দিক থেকে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তিবর্গ যেমন করে খাওয়ার টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বর্ণনাকারী রাসূলকে জিজ্ঞেস করেন হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি এ সময় সংখ্যালঘু হয়ে পড়ব? রাসূল (সা) বললেন না, তোমরা বরং সংখ্যার দিক দিয়ে হবে অনেক, কিন্তু তোমরা সমুদ্রের ফেনার মত ভেসে যাবে; তোমাদের বিষয়ে শত্রুদের মনে কোনরূপ ভয়ভীতি থাকবে না। তোমাদের মনে 'ওহন' বাসা বাঁধবে। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন-'ওহন' কি হে আল্লাহর রাসূল? রাসূল বললেন দুনিয়াপ্রীতি এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করা; আহমাদ ঃ ৫/২৭৮)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত ভাষ্যকার মোল্লা আলী কারী বলেনঃ কাফিরকুল এবং ভ্রান্তদের বিভিন্ন সংগঠন পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান জানাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হবার জন্য। মুসলিম ঐতিহ্য ও ঐক্য চুরমার করতে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়বে। খাওয়ার টেবিলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ খেতে বসলে যেমন কেউ বাধা দেয়া ভদ্রতা বিরোধী মনে করে, এদের অপতৎপরতায়ও কেউ বাধা দেয়া ভাল মনে করবে না। টেবিলের খাবার যেমন শেষ করে ভোজন বিলাসী ক্ষান্ত হয় তারাও মুসলিম তাহযীব তামাদ্দুন ইতিহাস ঐতিহ্য সব বিনষ্ট করে মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করে ফেলবে।

রাসূলের (সা) ভবিষ্যত বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত। সারা পৃথিবীর মুসলিম সমাজ আজ দানবরূপী এনজিওদের নীল নকশার শিকার। এ অবস্থার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন নেই। প্রতিটি সচেতন মুসলিম টের পাচ্ছেন মুসলিম মিল্লাতের কি সর্বনাশ হয়েছে ও হচ্ছে। পৃথিবীর সকল অঞ্চলে তথাকথিত বিশ্বসভ্য জাতিসংঘের বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুরা আজ তাদের নগ্ন থাবা সম্প্রসারিত করে চলেছে। দুঃস্থ মানবতার সেবার ছদ্মনামে আজ ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হচ্ছে। মুসলিম সমাজ আজ দিশেহারা ও অসহায়। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র জনগণের মাঝে কখনও গণতন্ত্রের সবক শেখানোর নামে, কখনও মানবাধিকার বাস্তবায়নের আবরণে আজ শত্রুরা তৎপর। আর অসহায় মুসলিম সমাজ এ সব চ্যালেঞ্জ মুকাবেলায় শুধু অপারগই নয় কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং নির্বাক মূর্তি সদৃশ।

মুসলিম মিল্লাতে ঐক্য যাতে না হয় সেজন্য ইসলাম ও মুসলমানদের চিরশত্রুরা সর্বদা সচেষ্ট ও তৎপর। তারা ইসলাম ও শরী'আতের বিভিন্ন বিধি বিধান সম্পর্কে কাল্পনিক সংশয় পেশ করে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার কাজে লিপ্ত। এগুলিকেই সভ্যতার চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। 'শরী'আতের আইন মধ্যযুগীয় বর্বরতা এবং জিহাদ হলো সন্ত্রাসবাদ' প্রভৃতি বিকৃত প্রচারণা চালিয়ে তারা এগুলি প্রত্যাখানের আহ্বান জানাচ্ছে অবিরত। তথাকথিত সভ্যতার নগ্ন চ্যালেঞ্জ হিসেবে মুসলিম বিশ্বের সবখানেই এ দৃশ্য প্রতীয়মান হচ্ছে। আল্লাহর দুশমনরা এ ব্যাপারে পূর্ণ মদদ যোগাচ্ছে। পূর্ব পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ প্রতিটি প্রান্তেই হিযবুল্লাহর বিরুদ্ধে হিযবুশ শায়তানের ছোবল অব্যাহত গতিতে চলছে। শত্রুরা সবচে বেশী তৎপর যে ক্ষেত্রে তা হলো যেন কোনক্রমেই মুসলিম ঐক্য গড়ে না উঠে। তাই এ ব্যাপারে যখন কোথাও মুসলিম সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় শত্রুদের মন বিষিয়ে উঠে তারা চক্রান্ত শুরু করে কেমন করে এটা বানচাল করা যায়। তাদের লক্ষ্য হল মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করতে হলে তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে এবং কোন ভাবেই তাদেরকে ঐক্যের সামান্য প্রচেষ্টাও চালাতে দেওয়া যাবে না। মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে পরিকল্পিতভাবে নানা অভ্যন্তরীণ-পারস্পারিক সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত রাখতে অমুসলিম শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ ও তৎপর।

তাই দেখা যায় তারা ইসলামের জন্য নিবেদিত ব্যক্তি ও সংস্থা সমূহের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত ভাবে ব্যাপক অপপ্রচার চালায়। সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলন গুলিকে তারা সন্ত্রাসী, মৌলবাদী প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত করে ইসলাম সম্পর্কে সাধারণের মাঝে ভীতি সৃষ্টি করতে চায়। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বাধীনতা প্রভৃতির এই স্বঘোষিত রপ্তানিকারকরা বড় বড় বুলি আওড়ালেও মুসলিম স্বার্থ দেখলেই মুখে কলুপ এঁটে বসে থাকে। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়া, মিন্দানাও প্রভৃতি মুসলিম অঞ্চলের যুক্তিযুক্ত স্বাধিকারের লড়াই, তাদের উপর চালান জঘন্যতম বর্বরতার ব্যাপারে তাদের ভূমিকার সোজা অর্থ দাঁড়ায় এরা যুদ্ধ ঘোষণার যোগ্য নয় এবং স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার মত উপযুক্ত স্বত্ত্বা এদের নেই। অথচ ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, সুদান, লিবিয়া সর্বশেষে আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের ক্ষেত্রে তারা নগ্ন দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করেছে।

৬. সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন ঃ

মুসলিম মিল্লাত সুবিনাস্ত ভিন্ন মতাদর্শের আঘাতে জর্জরিত। এই আঘাতের চিত্র বিভিন্ন রকম হলেও এবং পদ্ধতিগতভাবে চ্যালেঞ্জের উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবকিছুর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। আর তা হলঃ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তাদের সত্য দ্বীন থেকে সরিয়ে ফেলা এবং দ্বীনী বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ও জাল্লা ইরশাদ ফরমান ঃ

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى .

(ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। আপনি বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন তাই হল সরল পথ; বাকারা ঃ ১২০)

তিনি আরও বলেন ঃ

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم .

(আহলে কিতাব ও মুশরিদের মধ্যে যারা কাফির তাদের মনঃপুত নয় যে, তোমাদের পালন কর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক; বাকারা ঃ ১০৫)

অপর আয়াতে আরও বলা হয়েছে ঃ

ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء .

(তারা চায় যে, তাদের মত তোমরাও কাফির হয়ে যাও, যাতে তারা এবং তোমরা সব সমান হয়ে যাও; নিসা ঃ ৮৯)

মতাদর্শিক এ আগ্রাসনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

১. খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা ঃ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে খৃষ্টান বানানোর ক্ষেত্রে বড় বড় কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে খৃষ্টানরা বিশ্বের সর্বত্র সুবিনাস্ত ও সমন্বিত কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। অনেক মুসলিম দেশে তাদের এসব অপতৎপরতা সরকারীভাবে স্বীকৃত। এমনকি এসব কাজে তারা কখন কখনও সহযোগিতাও পেয়ে থাকে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনৈক্য আর অভাবকে পুঁজি করে এরা কোন কোন কর্মসূচী অতি গোপনে ও অপকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে চলেছে। আল্লাহর বাণী চিরন্তন ঃ

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم – (سورة الأنفال – ٤٦)

তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে; সূরা আনফাল-৪৬

২. প্রাচ্যবাদ ঃ পশ্চিমা পন্ডিতদের কেউ কেউ প্রাচ্য বিষয়ে এত অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়ে উঠেন যে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করতেই হবে যে তারা প্রাচ্যের বিশেষজ্ঞদের চেয়েও অধিক যোগ্যতার অধিকারী। তাদের কেউ 'মুসনাদে আহমদ' মুখস্থ করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়েছেন কেউ ইমাম শাফিঈর 'কিতাবুল উম্ম' আগাগোড়া কণ্ঠস্থ রেখেছেন, আবার কেউ 'সিহাহ সিত্তাহ' বিশারদ। এসব পন্ডিতদের সকলেই হয় খৃষ্টান অথবা ইয়াহুদী। এদের দু'একজন এ কাজ করতে গিয়ে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করেছেন। তবে সংখ্যা এতই নগন্য যে তা শতকরা হিসেবে শূন্যের কোঠায়। এরা ইসলামের নানা দিক নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সূক্ষ্ম অপপ্রচারে লিপ্ত। 'প্রাচ্যবিদ' বলে পরিচিত পশ্চিমা পন্ডিত ও তাদের অনুসারীদের দৃষ্টিতে মুসলিম 'জিহাদ' গর্হিত কাজ সমূহের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং 'প্রাচ্যবিদ' পন্ডিতদের উদ্দেশ্য যে খৃষ্টান বা ইয়াহুদী ধর্মের বিস্তার এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

৩. ধর্মহীনতা ঃ গত শতকের শেষ লগ্নে কমিউনিজম আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবার মধ্য দিয়ে নাস্তিকবাদী শক্তি তেমন জোরাল ভূমিকা রাখতে না পারলেও এদের সম্পর্কে সজাগ থাকা জরুরী।

৪. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ঃ মুসলিম বিদ্বেষী অপশক্তি এ কুফরী মতবাদটির আড়ালে মূলতঃ মুসলিম বিশ্বে ধর্মহীনতা এবং দ্বীন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায়। এদের অপতৎপরতার ফলে মুসলিম বিশ্বে এই জাহেলী মতবাদে আস্থাশীল একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। দুঃখজনক ব্যাপার হলো কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ফাঁদে পা দিয়ে তাদের মিশন এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে। তুরস্ক, আলজেরিয়া (এমনকি বিগত সরকারের আমলে বাংলাদেশকেও এই জঘন্য মিশন সফল করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে উৎসাহী হিসেবে দেখা গেছে) প্রভৃতি দেশের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। যদিও এসব দেশের জনসাধারণ রাষ্ট্রের এ ভূমিকার প্রচন্ড বিরোধী।

৫. কুসংস্কার, ঃ মুসলিম জাহানের একটা উল্লেখযোগ্য অংশে নানা ভাবে অনৈসলামিক কার্য কলাপকে ইসলামী বলে মনে করে থাকেন এটা সত্যিই দুঃখজনক। মুসলিম জামাআতে অভিনব কিছু বিষয়াদি ইসলামী বিষয়াদির সংগে মিশ্রিত হয়েছে, ব্যক্তি হতে শুরু করে পরিবার, গোত্র, সমাজ সর্বত্রই এই মিশ্রণ সঠিক আক্বীদাকে দূষিত করে ফেলেছে। বিভিন্ন বিজাতীয় সংস্থা- সংগঠন পরোক্ষভাবে এদের সাহায্য-সহযোগিতা করে, কেননা এর মাধ্যমে ভিতর থেকেই মুসলিম চেতনায় আঘাত করা সহজতর হচ্ছে।

৬. বহু মুসলিম ছাত্র/গবেষক শিক্ষার উদ্দেশ্যে বা প্রশিক্ষণ গ্রহণের লক্ষ্যে অমুসলিম দেশে গমন করে থাকেন। অনেকের ব্রেন ওয়াশ করা হয় ফলে অসংখ্য মুসলিম যুবক ইসলামের জানি দুশমন হয়ে ফিরে আসে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও রয়েছে তবে এরা সংখ্যায় নগন্য। বিস্ময়কর ব্যাপার হল এসকল ব্যক্তি আপন সমাজের সামনে এমন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়, ইসলামের দুশমনরাও সরাসরি ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে এমন চ্যালেঞ্জ দিতে সাহস পায় না। সাম্প্রতিক কালে মুরতাদ কাদিয়ানীরা এ চক্রান্তে লিপ্ত। আল্লাহ বলেন ঃ

كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون .

(سورة التوبة – ٨)

(কেমন করে? তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয় তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অংগীকারের কোন মর্যাদা দিবে না। তারা মুখে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু তাদের হৃদয় তা অস্বীকার করে; তাদের অধিকাংশে সত্যত্যাগী; সূরা তাওবা ঃ ০৮।)

৭. এন.জি.ওদের ষড়যন্ত্র ঃ ইসলামী সমাজের বুকে সবচে বড় চ্যালেঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এই তথাকথিত সাহায্য সংস্থাগুলি। অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি স্বাধীনতার শ্লোগান তুলে এনজিওরা ইসলামী

মূল্যবোধকে ধ্বংস করছে। নারীকে সকল ক্ষেত্রে পুরুষের মত সমান অধিকার দান এবং বিদেশী অমুসলিমের অন্ধ অনুকরণ ও আচার আচরণে তাদের সাদৃশ্যে গড়ে তোলা প্রভৃতি মতলবী প্রচারনা চালিয়ে তারা মুসলিম সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। মুসলিম সমাজে তাদের অপতৎপরতার ফলে আরও ভয়ানক যে দিক গুলি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হল ঃ

- ০ কুফরীর অনুশীলন এবং প্রকাশ্যে কুফরীর নগ্ন ঘোষণা।
- ০ অনৈক্য ও দলাদলি সম্প্রসারণ।

লাগামহীন ব্যক্তি স্বাধীনতার উদ্দেস।

- ০ মহিলাদের ঘরের বাইরে যথেচ্ছ ঘুরাফিরা ও যত্রতত্র কাজে যোগদান।
- ০ অপর পুরুষের সংগে মেয়েদের অবাধ মেলামেশা।
- ০ নারী পুরুষের মধ্যে সমতা বিধানের নামে অবাধ্যতার বিকাশ।
- ০ ন্যায় সংগত বহুবিবাহ ও তালাকের বিরুদ্ধে জনমত গঠন এবং অবাধ যৌনতার পথ সৃষ্টি।
- ০ সামাজিক আচার-আচরণে বিজাতীয়দের অন্ধ অনুকরণ এবং তাদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়া, প্রভৃতি।

সংস্কারকামী মানুষের জন্য এসব ফেৎনার মুকাবিলা করা দুরূহ কাজ, অনেক ক্ষেত্রে সংস্কার অসম্ভব হয়ে পড়ে। মুসলিম মিল্লাতে ঐক্য ও সংহতি ছাড়া বাঁচার কোন পথ নেই।

সভ্যতার চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় ঐক্যের প্রভাব

অনেকের ধারণা মুসলিম মিল্লাত বর্তমানে যে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করছে এটা সভ্যতার চ্যালেঞ্জ এবং অতীতে আর কখনও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। কথাটা ঠিক নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই মুসলিম মিল্লাত মার খাচ্ছে, লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করছে। তবে হঠাৎ করে এমনটি হয়নি, বরং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব বহুদিনের, পূর্বেও এরূপ সংকটকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ এ যুগেই শুধু দেখা যাচ্ছে এমনটি নয়, অতীতেও অমুসলিমরা মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং ধ্বংস যজ্ঞের জাল বিস্তারে তৎপর ছিল, বাগদাদের পতন এবং মুসলমানদের রক্তে বাগদাদের রাজপথ রঞ্জিত হওয়া এবং মুসলমানদের সভ্যতার সমুদয় সম্পদ দাজলা ও ফোরাতে নিক্ষেপের ঘটনা শত্রুদের বর্বরতার দৃষ্টান্ত। ইতিহাসের পাতায় এসব সুরক্ষিত রয়েছে। যখনই মুসলিম ঐক্য দুর্বল হয়েছে শত্রুরা তখনই মাথা চেড়ে উঠেছে। মুসলমানরা যখন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ল, তাদের বিজিত অঞ্চল সমূহে যখন স্বেচ্ছাচারিতা দানা বেঁধে উঠল, অনৈসলামিক কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ল, তখন ধীরে ধীরে মুসলিম মিল্লাতের গৌরব রবি অস্তমিত হল। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে মুসলিম মিল্লাত বর্তমানে এক সর্বগ্রাসী ভয়ানক চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে। মুসলিম মিল্লাতের সর্বত্র এই চ্যালেঞ্জ বিরাজ করছে।

ঐক্যের সংজ্ঞা, তাৎপর্য, ভিত্তি, লক্ষ্য এবং সবশেষে ঐক্যের বাধা সমূহ সম্পর্কে আলোচনার পর একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে একমাত্র ঐক্য অর্জিত হলেই মুসলিম বিশ্বের বর্তমান দুর্দশার সিংহভাগ লাঘব হবে। বর্তমান সভ্যতার চ্যালেঞ্জের সামনে মুসলমানের আত্মত্যাগ ও কুরবানী অতীতের ন্যায় বর্তমানেও দুনিয়ার চেহারা বদলে দিতে পারে। কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা মুসলিম মিল্লাতকে যেমন জাগিয়ে তুলেছিল তেমনই যুগে যুগে কারবালার ন্যায় বিপদ এলেই মুসলিম মিল্লাত জেগে উঠেছে এবং উঠবে এটাই স্বাভাবিক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়; মুসলমান যখন ঐক্যবদ্ধ ছিল, পৃথিবীর কোন শক্তি তাদের পরাস্ত করতে সাহস করেনি। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাত পৃথিবীর বহুদেশ জয় করে সেখানে অধিবাসীদের মনে ইসলামের আলো জ্বেলেছিল, সারা দুনিয়ার কাফিররা তখন মুসলমানদের ভয়ে ছিল

উত-সম্ভ্রম এবং মুসলিম মিল্লাতের কাছে অনুগত। ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই শুধু ইসলামের শক্তি ও সৌন্দর্য দুনিয়াবাসীর মনে প্রভাব ফেলতে সক্ষম ছিল তা-ই নয় বরং পরবর্তী শতাব্দী সমূহে এমনকি আব্বাসীয়, মামলুক ও উসমানী আমলেও ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ছিল গৌরবোজ্জ্বল। মহান আল্লাহর অমোঘ ঘোষণা ঃ

يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون . (سورة التوبة – ٣٢)

(তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। কাফিররা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চান না; তাওবা ঃ ৩২)

মুসলমান যদি দৃঢ় সংকল্প করে আল্লাহ তার সে কাজকে সহজতর করে থাকেন। মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য, সংহতি, পারস্পারিক সহযোগিতা এবং ঐক্যবদ্ধ সমন্বিত সংগ্রাম-ই বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ হতে মিল্লাতকে রক্ষা করতে পারে, সমস্যার আপাদ মস্তক পরিবর্তন করতে পারে। ইসলাম ও মুসলমানদের দুর্বার আন্দোলনের কাছে বাতিলের সকল ষড়যন্ত্র কর্পূর মতো উড়ে যেতে বাধ্য।

ঐক্যের উপায় সমূহ

একথা অবশ্যই সকলে স্বীকার করবেন যে এই ঐক্য অর্জন খুব সহজ কাজ নয়। উপরে বর্ণিত বাধা সমূহ অতিক্রম করা নেহায়েত কঠিন কাজ তবে অসম্ভব নয়। বর্ণিত সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে সুপরিকল্পিতভাবে এগুলিকে প্রতিহত করতে হবে। সর্বস্তরের মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলে ঐক্য অর্জনের মত মহৎ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। খুলাফায়ে রাশেদা ও উমাইয়া যুগে মুসলিম জাহানে যে শান্তি শৃংখলা ও ঐক্য বিরাজ করত সেই দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। প্রতিটি মুসলিমের এটাই কামনা ও স্বপ্ন। কিন্তু এ স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে, তবে কাংখিত ঐক্য অর্জিত হয়নি বলে নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়। ঐক্যের পথে বাধা-বিপত্তি আসবে এটা মেনে নিয়েই সামনে অগ্রসর হতে হবে। এ ব্যাপারে দুটো দিকের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে ঃ

১. ধৈর্য্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষা ঃ অনৈক্য একটি বিরাট সমস্যা। এ সমস্যার মূলোৎপাটনের জন্যে যেমন বড় কুরবানী দরকার তেমনই ধৈর্য্য ও দীর্ঘ সময় প্রয়োজন।

২. অব্যাহত দৃঢ় প্রচেষ্টা ঃ মুসলিম ঐক্য দৈবাৎ ঘটবে এমন আশা করা ঠিক না। ৫০টির অধিক মুসলিম দেশ চোখের পলকে একটা কনফেডারেশনে পরিণত হবে এমন আশা দুরাশা তবে অব্যাহত প্রচেষ্টা ও আস্থা এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।

ঐক্য অর্জনের উপায় ও মাধ্যম সমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

বুদ্ধিভিত্তিক উপায় ঃ

১. সমাজ থেকে শিরক-বিদআত ও কুসংস্কার দূর করতঃ আক্বীদা সংশোধনের কাজে গুরুত্বারোপ।

২. ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরে সর্বস্তরে ব্যাপক প্রচার চালানো।

৩. শিক্ষা নীতির সংস্কার, শিক্ষা পলিসি নতুন করে ঢেলে সাজানো।

৪. ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য প্রচার মাধ্যমকে পুরোপুরি কাজে লাগানো।

এ কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের আলেম ও শিক্ষিত সমাজ এ কাজে তৎপর হলে ঐক্য অর্জন ত্বরান্বিত হবে এতে সন্দেহ নেই।

৫. শরী'আত বিরোধী যাবতীয় মতবাদের মূলোৎপাটনে ধারাবাহিক সংগ্রাম চালাতে হবে।

রাজনৈতিক মাধ্যম ঃ

এর উদ্দেশ্য হবে বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল প্রভৃতি জাতীয়তাবাদ ত্যাগ করে একমাত্র কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতঃ মুসলিম জাহানকে পর্যায়ক্রমে একক নেতৃত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ব্যাপক সভাসমিতি, কনফারেন্স, সমাবেশ এর আয়োজন এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অত্যন্ত সহায়ক হবে। আলেম সমাজ এ ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। তার পূর্বে মুসলিম মিল্লাতের আলেম সমাজকে এক প্লাটফর্মে সমবেত করা গেলে এ লক্ষ্য সহজেই অর্জিত হবে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও ওলামা সমাজকে নিয়ে যৌথ সমাবেশের ব্যবস্থা করতে পারলে আরও ভাল হয়। কেননা ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম শুধু মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, মসজিদ থেকে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ সর্বত্রই ইসলামের ক্ষেত্র। বর্তমানে দেখা যায় শাসকবর্গ ও নেতৃবৃন্দ যেমন দ্বীনী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হন না তেমনই আলেমদের হাতেও কর্তৃত্ব থাকে না। সুতরাং এ দুয়ের সমাবেশ ঘটানো দরকার। কেননা ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন সর্বক্ষেত্রেই মুসলিম তার ইসলামী আক্বীদাকে নিয়ে চলবে। একজন মুসলিম যেমন হবেন দক্ষ রাজনীতিবিদ তেমনই তিনি ঈমানে হবেন বলীয়ান, পাক্কা মু'মিন। সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেমন তার হাতে থাকবে পবিত্র কুরআন তেমনই তার আরেক হাতে শোভা পাবে তরবারী। হক প্রতিষ্ঠা ও বাতিলকে প্রতিহত করার জন্য এ দুটিই মুসলিমের বড় অস্ত্র।

দ্বীনী ব্যাপারে দরদী ও ইসলামের স্বার্থ রক্ষায় আপোষহীন রাজনীতিবিদরা যদি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতেন, সকল মাধ্যমে যদি ইসলাম ও মুসলমানদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকত, মুসলিম জাহানের দেশ সমূহের মধ্যে যদি ভ্রমণ ভিসার কড়াকড়ি না থাকত, কিংবা একদেশ থেকে অন্য কোন মুসলিম দেশে অভিবাসন স্বাগত জানানো হতো, যদি গরীব মুসলিম দেশগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্যও সহযোগিতার ক্ষেত্রে ধনী মুসলিম দেশগুলো তৎপর হত, মুসলমান দেশসমূহ পারস্পারিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসত এবং এ ব্যাপারে আন্তরিকতার পরিচয় দিত তাহলে মুসলিম ঐক্য জোরদার ও সুদৃঢ় করা সম্ভব হতো।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক মাধ্যম ঃ

মুসলিম বিশ্বের সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে হলে ইসলাম বিরোধী চক্রের চ্যালেঞ্জ গুলির ব্যাপারে ভেবে-চিন্তে পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এসেছে। বিশেষ করে সাহায্যের ছদ্মাবরণে এনজিও গুলির ইসলাম নির্মূল অভিযানের মোকাবেলায় বিকল্প কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মুসলিম তরুণ সমাজের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের পাশাপাশি নারীদের অবস্থানের উন্নয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। একবিংশ শতকের এই চরম উৎকর্ষের যুগে বাস্তবতাবকে অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। কবির ভাষায় বলা যেতে পারে ঃ

وليس يصح فى الاذهان شئ * اذا احتاج النهار الى دليل-

"মধ্য দুপুরে দিবস যদি নিজ প্রমাণের জন্য যুক্তি খোঁজে তাহলে বুঝতে হবে মস্তিস্কে গোলমাল আছে।"

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহর সীমার মধ্যে থেকে সবকিছুকে উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতঃ সার্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিকল্প ধারার সৃষ্টি করতে হবে। দা'ওয়াত ও তাবলীগ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানমালা, বক্তৃতা-বিবৃতি প্রভৃতি প্রচারে অত্যন্ত যত্নসহকারে রেডিও,

টিভিসহ সম্ভাব্য সকল প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যাপারে আরবী ভাষার একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে বলে আমি মনে করি। কেননা ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহের বিকৃতি রুখতে আরবী ভাষার গুরুত্ব অত্যধিক। মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐক্য অর্জনে এ ভাষার সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তাছাড়া ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণে আরবীর ভূমিকাও অনস্বীকার্য। পৃথিবীর প্রায় ২২টি দেশের সরকারী ভাষা আরবী। একক কোন ভাষার স্বদেশ এতটা প্রশস্ত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ভাষা ইনষ্টিটিউশন গুলোতে অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহে আরবীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে অনারব মুসলিম বিশ্বে আরবী ভাষার প্রচার ও প্রসার ঘটান অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য সুসংহত হতে পারে।

অর্থনৈতিক ঐক্য ঃ

মুসলিম বিশ্বের দেশ সমূহ নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক জোট গঠন করে একদেশ অপর দেশের পরিপূরক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। এই জোট নানা ধরনের হতে পারে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রূপরেখার প্রতি ইংগীত করা হল ঃ

১. মুসলিম দেশসমূহের একটা কমন মার্কেট গড়ে তোলা, কমন মার্কেটের মাধ্যমেও মুসলিম বিশ্ব নিজেদের বহু বিরোধ মীমাংসায় সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। সদস্য দেশগুলো অর্থনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ভাবেও সুসংগঠিত হতে পারে।

২. মুসলিম বিশ্বে অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে, যেভাবে 'ইউরো' ইউরোপে সাফল্যের সংগে এগিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের মতপার্থক্য দূরীকরণে এর প্রভাব নিশ্চয়ই ইতিবাচক হবে।

৩. ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান। ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন সুদী ব্যাংক এবং এনজিও পরিচালিত ব্যাংকের নির্যাতন মুকাবেলায় সফল হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এভাবে মুসলমানরা পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক আগ্রাসন রুখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

৪. মুসলিম উম্মাহর-বিপুল জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে এই জনশক্তির সংখ্যা বর্তমানে একশত পঁচিশ কোটির অধিক।

এ বিশাল ধন-সম্পদ ও এই বিপুল জনশক্তির সঠিক ব্যবহার হলে অমুসলিমদের সহায়তা ছাড়াই মুসলিম দেশসমূহ স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে। সৌদি আরবে অধিবাসী হিসেবে অমুসলিম নেই। তবে কাজের সন্ধানে ও প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন দেশের বিপুল সংখ্যক অমুসলিম সে দেশে অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে থাকেন। অথচ সে তুলনায় বিদেশী মুসলিম জনশক্তি সেখানে নেই। মুসলিম ঐক্য ছাড়া এ লক্ষ্য অর্জিত হবে না।

অন্যান্য বাধার চেয়ে অর্থসম্পদের বাধা সহজ বলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে চিহ্নিত বাধা সমূহ অতিক্রম করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। তাছাড়া মুসলিম বিশ্বের সম্পদও কম নয়, প্রয়োজন শুধু পারস্পারিক সুষম বিনিময়। এই সকল চ্যালেঞ্জ দূরীকরণে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মুসলমানদের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রসার ঘটান পূর্ব শর্ত।

উপসংহার ঃ

আল্লাহর ফযলে ইসলামের ভবিষ্যত অত্যন্ত উজ্জল। ঐক্যের পথে শত বাধা-বিপত্তি থাকলেও ক্রমাগত একনিষ্ঠ সংগ্রাম চলতে থাকলে ঐক্য অর্জিত হবেই হবে। মু'মিনরা আল্লাহর রহমত থেকে কখনও নিরাশ হয় না। তাদের অনৈক্য বিদূরিত হবে এবং হারানো ঐতিহ্য ও হৃত গৌরব আবার ফিরে আসবে আমরা তারই প্রত্যাশী।

যাত্রা তবে শুরু হোক

প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান*

কুরআন ও সুন্নাহর আলোয় জীবন পথ পরিক্রমায় যে সরল পথের হাতছানি সেখানে থাকে গতিময়তা, বেগবান জীবনের জয়গান। বৃদ্ধের পান্ডুর চাহনী, নিরাশার ভীতি, প্রতিবন্ধকতার হতোদ্দম আর ক্রমাগত পরীক্ষার পেরেশানী জীবন যেখানে অবসর নিতে চায় সেখানেই যৌবনের চলার ছন্দ যেন দ্রুত গতি ফিরে পায়। সামনে তারুণ্যের প্রবাহ নবজীবনের জোয়ার সৃষ্টি করে। গত দিনের পড়ন্ত সূর্যের শেষ লালিমাটিই যেন আজকের প্রভাতের নতুন সূর্যের শত আশার আলো ছড়িয়ে দিন শুরু করে। আমরা কি বৈকালিক অস্তাচলের দিকে তাকিয়ে রাতের প্রহরে জীবনকে আঁধারের নিস্তব্ধতায় সঁপে দেব? না ভোরের আলোয় সারাটা দিন ব্যাপী জীবনটাকে কর্মময় আশা ভরসায় ভরে তুলব? এক সারি বয়োবৃদ্ধের অবসর প্রাপ্ত জীবনের শেষ প্রহরের হিসেব কথা ডাইরীর পাতা উল্টাব না একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় নতুন পরিকল্পনা নিয়ে তাওহীদ আর সুন্নাহর দিক নির্দেশনাকে যুগচাহিদার পটে সাজিয়ে বাস্তবতার প্রেক্ষিত রচনা করব?

কবি ফররুখ আহমদের কথায় ঃ

দেখো জমা হ'ল লালা রায়হান তোমার দিগন্তরে
তবু কেন তুমি ভয় পাও, কেন কাঁপো অজ্ঞাত ভরে।
তোমার জাহাজ হয়েছে কি বানচাল,
মেঘ কি তোমার সেতারা করে আড়াল?
উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির আজো মেটেনি কি সব দেনা?
সকাল হয়েছে, তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?

শত বছর ধরে যে জমঈয়ত সোনা দরিয়ার তরঙ্গ বেয়ে লক্ষ্য পানে অগ্রসরমান তার মাঝি মাল্লাদের তো নতুন দিনের রিক্রুট নিয়ে দ্রুত চলতে হবে। এখনও তো বন্দর বহুদূর। প্রাপ্তি যা তাতো সামান্য কিন্তু প্রাপ্য যে ঢের বেশী। প্রয়োজন আরো বেশী। ফলে নিশি দিনের অবকাশ কোথায়? ভোর হ'ল যদিও আকাশে মেঘে ঢাকা সেতারা এখন আড়াল করে। নওজোয়ান-শুব্বান তোমাদের যে বড্ড প্রয়োজন ঐ দূর পথ পাড়ি দিবার জন্য সব হিম্মত হিকমাত ইলম হিলম আর আমল উজাড় করা রসদের। চোখ মুখে যে প্রত্যাশার দ্যুতি জ্বল জ্বল করছে তা তো নতুন প্রভাত সৃষ্টি করতে চায়।

পূর্বাশার আলো কবিতায় কবি আহসান হাবীব বলেন ঃ

ওরা এখন পার হতে চায় দুর্গম দীর্ঘপথ
শোন, ওরা বলে, রাত শেষ হয়ে এল।
পূর্বাশার আলো ঐ দেখা যায়।

---

* সাংগঠনিক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; অধ্যক্ষ, কলারোয়া সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।

চারিদিকে যখন যুবগোষ্ঠী বাতিলের নিশান নিয়ে মুসলিমের জীবনে শিরক আর কুফর, বিদআত আর ইলহাদ সেটে দিবার সব কোশেষ করে এক ইবলিসের মহোৎসবের আয়োজন করে চলেছে সেখানে তাওহীদের নিশান হাতে নিয়ে এখন ভীরু পদে দুরু দুরু বুকে পড়ন্ত বেলার দিকে চেয়ে সেকেন্ড মিনিটের কাঁটা গুনবার সময় কোথায়? রাত যে নেমে এল। জীবনে আর কতবার প্রভাতী দোয়েল কোয়েল ঘুম ভাঙ্গাবার ডাক দিয়ে যাবে?

কবি আব্দুল কাদিরের 'জয় যাত্রার' ডাক এখনও কি নবীনদের দোর গোড়ায় পৌছে নাই?

যাত্রা তব শুরু হোক হে নবীন কর হানি দ্বারে
নবযুগ ডাকে যে তোমারে।
তোমার উত্থান মাগি, ভবিষ্যৎ রহে প্রতীক্ষায়,
রুদ্ধ বাতায়ন পাশে শংকিত আলোক শিহরায়
সৃজন-উৎসব আজি, হে নবীন খুলে দাও দ্বার,
আনো তব নব উপহার।
অসত্য অন্যায় যত ডুবে যাক সত্যের প্রসাদ
পিয়ে লভ অমৃতের স্বাদ
অজস্র মৃত্যুর লঙ্ঘি, হে নবীন, চলো অনায়াসে,
মৃত্যু জয়ী জীবন উল্লাসে।

যথার্থ ডাক- যথাসময়ের আহ্বান। এটা কি উপেক্ষা করা চলে? যাদের হাতে শাশ্ত জীবন বিধান আল কুরআন ধরা- যারা বুকে করে চলে সহীহ্ হাদীসে রাসূল, যারা উত্তরসূরী বলে দাবীদার উসামা বিন জায়েদ বিন হারিসা, খালিদ বিন ওয়ালিদ, আবু উবায়দাহ, মুসান্না, মুহাম্মাদ বিন কাসিম, তারিক বিন জিয়াদ আর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার প্রমুখের? মুখের দাবী ছেড়ে রুদ্ধ বাতায়নের কপাট খুলে বেরিয়ে আসতে বাধা কোথায়?

যাদের সাথে শয়তান, তারা আজ আওয়ান মাঠে, তারা বেগবান, মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত রাজপথ, মুহুর্মুহু আওয়াজ ইথারে ইথারে ভাসমান যান্ত্রিক নিত্য নতুন মিডিয়ায়। অথচ যাদের সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছে বদরের রক্তাক্ত প্রান্তর, উহুদের রক্ত ঝরা গিরিকান্তার, খন্দকের আর ইয়ারমুক কাদিসিয়ার রণাঙ্গন, বালাকোট আর আন্দালুসিয়ার গুয়াডাল কুইভার নদী তট-সেই আশীষপুষ্ট মদদ চাইতে কেন মানা তাওহীদি কাফেলার?

হাতে তলোয়ারের বাট রেখে আর সন্ত্রাসী চোরাগুপ্ত হামলার নাম কিন্তু জিহাদ নয়। দারুল আরকাম হতে যে জিহাদী সবক উঠেছিল হেরা পর্বত শিখর ছুঁয়ে- কাবার মালিকের শপথ নিয়ে সেখান থেকেই শুরু করতে হবে। হৃদয়ে শত সহস্র লাত মানাতের মায়া মহব্বত জড়িয়ে কোনদিন মুক্তাসদৃশ নফসে মুতমাইন্না পয়দা হয় না। আর জান্নাতুল মা,ওয়ার তামান্না আসে না।

চলমান তাওহীদ-সুন্নাহর আওয়াজ যেন ম্রিয়মান এক রুগ্নশিল্পের ভর্তুকীর ন্যায়, এখানে জীবনের স্পন্দন শুনতে হয় কান পেতে ক্ষীণ অতি ক্ষীণ স্বরে যন্ত্রের সাহায্যে। চারিদিকে যেন কিসের অজানা আশংকা ভীড় করে আছে। জাপটে ধরেছে পার্থিব জীবনের শত অকটোপাশের বন্ধনী। নির্ভীকও যেন চুপসে যাচ্ছে যুগ যুগান্তরের প্রহরায় প্রবল শাসনে। যথেষ্ট প্রজ্ঞায় ভর করে যুগমানস শাণিত করে এগিয়ে

যাবার প্রচন্ড দাবী চতুর্দিকে। চলতে গেলে প্রতিবাদের প্রবল ঝড় উঠবে। কিন্তু যেমনি আছ তেমনি থাক, এ হলে মসৃন পথ, অথচ তা রুদ্ধ। পোষ মানা গৃহপালিত প্রাণীর প্রাণ যে কত সস্তা দরে কেনাবেচা হয় তা বর্তমান চলতি গণতন্ত্রের অনুশীলনীতে দৃশ্যমান। কিন্তু তরুণদের জীবন এ পথে চলতে পারে না। তারা বেআদব নয় বরং বাআদব। তারা দুর্বিনীত নয় অথচ বিনীত। তারা অহংবোধের পন্য নয় বরং বিশ্বস্ত ও আনুগত্যের সবকে উদ্দীপ্ত। তবে সঠিক নির্দেশনাই তাদের কাম্য-চাওয়া পাওয়া। এটা ব্যত্যয় ঘটলেই সেই উদ্দেশ্যহীন চালককে যেমন দানব সাবাড় করেছিল সেটাও বিবেচনায় রাখা নিশ্চয় প্রয়োজন। নইলে চমৎকার একটা প্রভাতী জীবনকে যারা থমকে দেয় চলার পথে- পথের দাবী তো তাদের ক্ষমা করতে পারে না। তাই তো সবুজের অভিযান কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ ওরে অবুঝ
আধ মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ান ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে,
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়
আয় প্রচণ্ড, আয়রে আমার কাঁচা।

গতানুগতিক ঘুনে ধরা আধমরা জীবনে স্পন্দন জাগাতে গেলে প্রচন্ড প্রত্যয় নিয়ে জোরে ধাক্কা দিতে হবে। কিন্তু নিজের অবস্থানকে মজবুত না করে শক্ত দেয়ালের ধাক্কায় দেয়াল না পড়ে মাথাটা যাতে গুড়ে না যায় সেটা আগে ভাগে বারংবার পরখ করাটাই সমীচিন। বাধা আসবে, শাসন শোষণ নির্যাতন এবং নানা ধরনের কষ্ট ক্লেশ যে আসবে না- এটা আদৌ ঠিক নয়। তার-জন্য প্রয়োজন অনেক কিছুর। সেই সঞ্চয় কত টুক, কত দিনের এবং কত মানের, মাপের এবং কত টেকসই সেই যাচাই বাছাই করার কাজটা যে বড্ড প্রয়োজন। আজকে তরুণ নবীন যুবকদের যে গোষ্ঠীবদ্ধ দল সেই দলের ঐ জিনিষগুলি তৈরী হচ্ছে কিনা সেই গবেষণাগার, সেই চর্চাকেন্দ্র, সেই পরীক্ষা কেন্দ্র এবং যাছাই বাচাই প্রক্রিয়ার উপাদান উপকরণ আছে কি নাই সে দিকে নজর কতটুক তা দেখতে হবে। পরিকল্পনা গ্রহণে গড়িমসি, গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দীর্ঘ সূত্রিতা, নেতৃত্বের জেদ ও হঠকারিতা, একক আধিপত্য বিস্তার মনোভাব পরিহার কর্মকে যেমন উৎসাহিত করে তেমনটি সংগঠনের ঐক্য মজবুত হয়। এটা নাই, ওটা নাই, নাই নাই, কিছু নাই,- এ বলার সময় নাই। হতাশা নিরাশা আর বিষাদ ভরা জীবনকে তো অস্বীকার করেই ইতিবাচক আশাব্যঞ্জক উজ্জল ভবিষ্যতের সম্ভবনাময় জীবন গড়ার বলিষ্ঠ শপথ নিয়েই তরুণ তরুনদের যাত্রা। ঠিক এমনি এক জীবনের জয়গান গেয়েই কবি কামিনী রায় 'পরার্থ' কবিতায় বলেছেন-

বিষাদ বিষাদ্ বিষাদ বলিয়ে
কেনইবা কাঁদিবে জীবন ভরে?
মানবের মন এত কি অসার?
এতই সহজে নুইয়া পড়ে?
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে

আসে নাই কেহ অবনীর পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

শূন্য হাতে পূর্ণ বুকে যার ঈমান দুকুল প্লাবিত করে ছুটে চলেছে জনপদ হতে জনপদে আরাফাতের সওগাত নিয়ে ইনকিলাবী চেতনার দ্বারে আঘাতের পর আঘাত হেনে সেই তো বিজয়ী ঝাণ্ডা উচ্চ শিখরে তুলে বলবে আমি তরুণ/ আমি সুচিশুভ্র হৃদয়ে আগুয়ান/ যত জঞ্জাল জগদ্দল পাথর সরাতে বজ্রহাতে আমি বেগবান/ কুরআন হাদীছ মন্থন করে, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করে আমলের নিখুঁত পথ ধরে আমি চলি দুর্জয় আকাংখায়-আমার লক্ষ্য আশরাফুল মখলুকাতকে ইবলিসী শিকল হতে মুক্ত করা। এ পথের পথিকদের লক্ষ্য করেই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'মানুষ কে' কবিতার উচ্চারিত ঃ

নাহি চায় আপনার পরিবার সুখ,
রাজ্যের কুশল কার্যে সদা হাসি মুখ
কেবল পরে হিতে প্রেম লাভ যার
মানুষ তাকেই বলি, মানুষ কে আর?
নাহি চায় রাজপদ নাহি চায় ধন
স্বর্গের সমান দেখে সব উপবন
পৃথিবী সমুদয় নিজ পরিজন।
সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন।

মানবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হলেই সেই অদেখা মান্না সালওয়া হাজির হতে কতক্ষণ? এ প্রশিক্ষণ সর্বাগ্রে। নেতৃত্বের মোহ, ধনসম্পদের দুর্বার আকাংখা, কামিনীর উদগ্র কামনা- ঐ চাওয়া পাওয়ার অন্তরায়। যে যুবক এ প্রতিবন্ধকতা উত্তরণ করে কুরআনী কানুনে জীবন গড়তে পারে আর রাসূলের জীবন নিয়ে নিতান্ত অন্তরংগে মাবুদের নিকট চাইতে পারে- তাহলে সে পাবে যা তার কাম্য।

বর্তমান বিশ্বের চতুর্দিকে আওয়াজ-রুশ চৈনিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বার্তা, মার্কিনী-ইউরো পুজিবাদী কণ্ঠ ইহুদী আর পৌত্তলিক সম্প্রসারণবাদী নিনাদ যেন মুসলিম মানুসকে ঘিরে ফেলেছে। ঐ ত্রিভুপতিদের নিকট মুসলিম বিশ্ব যেন সব কিছু হারিয়ে নতজানু হয়ে হাটু গেড়ে বসে কৃপা ভিক্ষা চাইছে। এ দৃশ্যেই বোধ হয় দার্শনিক কবির কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল

یوں تو سید بھی ھو مرزابھی ھو افغان بھی ھو
تم سبھی کچھ ھو بتاؤ تو مسلمان بھی ھو ؟

তুমি সৈয়দ, মির্জা, আফগান-সব কিছুই হতে পার কিন্তু বল দেখি- তুমি মুসলমান আছ তো?

سبق پھر پڑہ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا
لیا جائیگا کام تجہ سے دنیاکی امامت کا .

তুমি আবার নতুন করে পড় সততার, ন্যায় বিচার এবং শৌর্য বীর্যের সবক আবার তোমার দ্বারা দুনিয়ার নেতৃত্বের কাজ নেয়া সম্ভব।

ঐ ত্রিভূপতিদের কব্জায় শিকার অসহায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া আর দক্ষিণ এশিয়া এবং ইউরোপ ও আমেরিকার অসংখ্য জনপদ। সেদিকেও সজাগ ও সবাক কথা থাকবে জাগ্রত তাওহীদবাদী সংগঠনের।

আজকের বাংলাদেশের জমঈয়তের যে কার্যক্রম তা মূলতঃ আত্ম ও বহির্মুখী দা'ওয়াহ কেন্দ্রিক। ইসলাহ ও তানযীমের দিকটা বেশ মজবুত নয়। কিন্তু শুব্বানকে এ বিষয়ে অনেক অনেক মজবুত এবং দৃঢ় হতে হবে। কেননা অনেক পথ চলতে হবে অনেক ভারী বোঝা বইতে হবে অনেক অনেক দিন ধরে। ভিন্নভাবেই এ পথে এগুতে হবে জমঈয়তের লক্ষ্য পানে। প্রতিবাদী, প্রতিপক্ষ, স্বাধীন, বিপক্ষ, সমান্তরাল পক্ষ এর কোনটাই নয় বরং সহায়ক শক্তি হিসাবেই একাজে বেশ দক্ষতার সামানসহ নির্দিষ্ট ছকে ক্রমাগত ভাবে জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরে কাজে হাত দিতে হবে। এ সংগঠন যেন একটা Institution হতে পারে। জবাবদিহিতা, আর্থিক স্বচ্ছতা, পরহেজগারী এবং ইলমী তা'লীম তরবিয়াত যেন এর প্রাণ শক্তি হতে পারে। সুধিজনের নজর কাড়তে পারে, স্নেহ আকর্ষণ করতে পারে এবং আস্থা অর্জন করতে পারে এমনটি যদি এক একটা তরুণ নবীন প্রবীণের সামনে এসে দাঁড়ায় তবেই হৃদয় উৎসারিত চাওয়া পাওয়া উথলে উঠতে বাধ্য। যাকে নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান বা Institution গড়তে হবে তাকে অবশ্যই শিক্ষা প্রশিক্ষণ পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে তা করতে পারলে তবেই বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাবে, জাতীয় কবি তারুণ্যের কবি বিদ্রোহী কবির 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' কবিতা ঃ

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মত?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী নিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তরী পার
তিমির রাত্রি মাতৃ মন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিছে অভিযান!
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান!
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার।

নেতৃত্বের মোহ, ক্ষমতার আকর্ষণ আর অধীনস্থের উপর কর্তৃত্ব করার দুর্বার লিপ্সা যেখানে প্রচণ্ড সেখানে নেতাকর্মী না হয়ে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। খবরদারী জমিদারীর মত সামন্ত প্রভুর হুকুমে অধীনস্থেরা আজ্ঞাবহ শ্রেণীতে রূপান্তর করার খায়েশ তীব্র হয়। নেতা মাঠকর্মী না হয়ে কেবল নেতৃত্বের আসনে বসে হুকুম করবে, তার দোষত্রুটি আমল আখলাক আমানতদারী আর পরহেজগারী প্রশ্নের উর্ধে রেখে কর্মীদের শাসনে তৎপর খুব এমন মানসিকতা হলে নেতা ও কর্মীর মধ্যে দুরাতিক্রম ব্যবধান সৃষ্টি হবে। এর ফলে আনুগত্যে চিড় ধরে ঐক্যের ফাটল সৃষ্টি হবে। নেতা কর্মীর সামগ্রিক কার্যক্রম যদি পরামর্শ ভিত্তিক না হয়, স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার না হয় কোথাও যদি সন্দেহ লুকিয়ে থাকে তবে তা সংগঠনের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। উঁচু-নিচু, প্রভু-ভৃত্য, মনিব-দাস সুলভ মানসিকতার অবসান একটি উজ্জ্বল সম্ভবনাময় সংগঠনের অগ্রযাত্রার পূর্বশর্ত। নেতার জন্য জান দিবে কর্মী, কিন্তু কেন? ব্যক্তি সেখানে বড় নয়। নেতৃত্ব আর যে আদর্শের উপর নির্মল আকর্ষণীয় নেতৃত্ব সক্রিয় তার জন্য কর্মীর মোহ সৃষ্টি হয়। এখানে পদমর্যাদা অর্থপ্রাপ্তি আদৌ আসতে পারে না। নেতা আর কর্মী একই পায়ে চলার পথের যাত্রী একজন রাহবার অন্যেরা পদাংক অনুসারী। কিন্তু উভয়ের শ্রমক্লান্তি সমভাবে শরীর থেকে ঘর্মবিন্দু

ঝরছে। তবেই না ভক্তি দৃঢ় হবে। নইলে একজন যন্ত্রযানে অন্যরা পদব্রজে, একজন সুপেয় অন্নগ্রহণে অন্যরা শুকনা রুটি চর্বনে, একজন নরম শয্যায় অন্যেরা মৃত্তিকার বিছানায় এমনটি যেন না হয় নেতা কর্মীর সম্পর্ক।

দুনিয়ার সেরা মানুষ, জগৎধন্য নেতৃত্বের যে আসনে নবীশ্রেষ্ঠ রাসূলকুল ভূষণ সমাসীন তার আদর্শ কি আজকের নেতাদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে না? নিপীড়িত, নির্যাতিত হয়ে প্রাণসংহার দশা হতে শত শত মুহাজিরে মক্কীর সাথে যে নবী এলেন ছিন্নমূল কাফেলার নেতা হয়ে মদীনায় তার কার্যাবলী কি আমরা প্রত্যক্ষ করব না? ঘর নেই, সম্পদ নেই, নেই সুখের সংসার। চারিদিকে দৈন্য, দারিদ্র, অনাহার ঘিরে ধরেছে। এ মুহূর্তে মহানবী (সা) শুরু করলেন মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ। তিনি তো রাসূল। হুকুম দিয়ে বসে থাকলেও তো হ'ত। কিন্তু না। তিনি যে মানুষের নবী-মানবতার মূর্ত প্রতীক! সাহাবায়ে কেরামের মত তিনিও নগণ্য নির্মাণ শ্রমিক রূপে পাথরখন্ড আর ইট বয়ে চলেছেন মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজে। মুখে উচ্চারিত হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشَ الآخِرَةِ - فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ -

"O Allah! no bliss is there but that of the Hereafter. I beseech you to forgive the Emigrants and Helpers.

হে আল্লাহ! আখিরাতের পরম সুখ ব্যতীত আর কিছুই নাই, তুমি ক্ষমা কর মুহাজির ও আনসারদেরকে। (সহীহ বুখারী, যাদুল মা'আদ, রাহীকুল মাখতুম ১২, ১৮৭)

এ ধরণী কি এ দৃশ্য কেবল একবারই দেখেছে? না, বারংবার দেখেছে? খন্দকের পরিখা খননের সময়, উহুদের তীব্র লড়াইয়ে আর সুদূর তাবুকের পথে রণাঙ্গনে। এই না হলে কি নেতৃত্বের আবহ সৃষ্টি হয়? না জানবাজ কর্মী তৈরী হয়? না সংগঠন বুনিয়ানুম মারসুস হয়? না জান্নাতের আশা করা যায়? মহান আল্লাহ তার মনোনীত দ্বীনকে পছন্দসই একদল জানকুরবান নওজোয়ানকে বাছাই করে যমীনে বিজয়ী করার যাবতীয় হিম্মত মদদ ও তাওফীক দিন। আমীন।

"ধর্মের প্রভাব কেবল মসজিদে ও কবরস্থানে সীমাবদ্ধ থাকবেনা, ভূমিষ্ট হওয়ার সময় হতে কবরস্থ হওয়া পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের প্রভাব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রত্যেক স্তরে, জীবনের কর্মসাধনার প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমান ও অপ্রতিহতভাবে কার্যকরী হবে।"

—আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী

শিক্ষা, বিজ্ঞান, আল-কুরআন ও বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী সমাচার

ডঃ এ. কে. এম. আজহারুল ইসলাম*

ইন্নাদ্-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম- ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। ইসলাম আমাদের কাছে অতি প্রিয়- একে আমরা এক পূর্ণ জীবনাদর্শ বিবেচনা করে থাকি। পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর হাদীস হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের উৎস আর কর্মের প্রেরণা। এখানে দুই ধরনের জিনিষ লক্ষ্যণীয়- (ক) ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও বুনিয়াদী বিষয়সমূহ (খ) ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয়। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয়সমূহে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কারণে সুন্নাহর আসল রূপ থেকে আমরা ক্রমেই যেন সরে যাচ্ছি। অনেক তথাকথিত মাওলানা আছেন যারা অনৈসলামিক কার্যকলাপ তথা পীর-পূজা, কবর-পূজা ইত্যাদিতে কোন বাধা দেন না বরং তা থেকে আর্থিক সুবিধা ভোগ করেন। একদল এমনও আছেন যাদের কার্যকলাপ ইসলাম বিরোধীদের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। এ সব কারণেই কুরআন তথা ইসলামের মৌল বিষয়ের বিকৃতি আজকাল জোরেসোরে প্রচার করা হচ্ছে। কাদিয়ানী ও নাস্তিক্যবাদী ধ্যান-ধারণা ভিত্তিক ফিৎনা এগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে বাংলাদেশে তথাকথিত বাম বুদ্ধিজীবীগণ তাঁদের লেখা ও প্রকাশ্য উক্তির মাধ্যমে বাধাহীন ভাবে নাস্তিক্যবাদী ধ্যান-ধারণা প্রচার করছেন। এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা ও রাজনীতিবিদ একাজে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এদেশের কোটি কোটি মানুষের ইসলামী জাতিসত্ত্বাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে- তাদেরকে মুশরিক, নাস্তিক, বেঈমান বানাবার মুশরিকী ও নাস্তিক্যবাদী ষড়যন্ত্র চলছে। এর অংশ হিসাবে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ও শিক্ষাংগণে এক শ্রেণীর লোক ক্ষিপ্রতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামী মূল্যবোধকে তারা আহত করে আসছে বহু আগে থেকে। এখন তারা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসে আঘাত হানা শুরু করেছে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তরুণদের মাঝে অতি সুকৌশলে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে।

তরুণদের সবচেয়ে বড় আদর্শ আবাসস্থল হলো তাদের শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে যুবশক্তি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটা দিশা খুঁজে নেবার চেষ্টা করে। এ জন্য তারা পরস্পর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জ্ঞানকে প্রবহমান রাখে। আদর্শের তাড়নায় তারা সবসময় সচেতন থাকবে- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য- এখানে একই সাথে জ্ঞান ও প্রাণ হত্যা করা হচ্ছে- এখানে পাঠ্য হিসাবে চালু রয়েছে জ্ঞানের প্রতিযোগিতার বদলে পারস্পরিক উৎখাতের ষড়যন্ত্র। অগণতান্ত্রিক পেশী শক্তিই যে শিক্ষাংগণ নিয়ন্ত্রণ করছে তা বলাই বাহুল্য। আশা-আকাংখার স্বপ্নের ভিতর তরুণেরা সজীব জীবন প্রত্যাশা করে- কিন্তু তার পরিবর্তে ক্যাম্পাসে আজ মৃত্যুর বীজ ছড়ানো। আজ সেখানে বনহিংস্রতার লক্ষণ- অস্ত্রচালানী, বোমাবাজি, বন্দুকবাযী, চাপাবাযী, দলবাযী, নকলবাযী ও চর-দখলের মত সিট/হল দখলবাজি চলছে।

অভিজ্ঞতাহীন তারুণ্যকে তথাকথিত 'প্রগতিশীল বামপন্থী চিন্তাভাবনা' তড়িৎপ্রবাহের মতই আন্দোলিত করে। এই আবেগ-স্পন্দনের সুযোগ নিয়ে নৈরাজ্যবাদী নাস্তিকেরা ছাত্রদের মাঝে হিংসার বীজ বপন করে চলেছে। কোমলমতি তরুণদেরকে ইসলাম সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ করে তুলছে। বিবেকের মানদণ্ড অর্জন করার

* প্রফেসর, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সকল পথ তাঁরা রুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত। শিক্ষাংগনে গা ছমছম করার মত পরিস্থিতি বিরাজমান আজ। সাধারণ মানুষ আজ শিক্ষাংগনে যেতে ভয় পায়- এই বুঝি হাইজ্যাকারের কবলে পড়তে হল, এই বুঝি ছুটে এলো মলোটভ ককটেল বা বন্দুকের গুলি ...। এইতো পরিবেশ আমাদের।

শিক্ষাদান, জ্ঞান-অন্বেষণ এবং সত্যের অনুসন্ধান করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের পরম দায়িত্ব। কিন্তু আমরা কি করছি? আমরা শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব ক্রমেই ভুলে যাচ্ছি। আচার-আচরণ ও অযোগ্য শিক্ষকেরা নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকতে বা অতিরিক্ত সুবিধা লাভের জন্য আজ দলবাজির আশ্রয় নিচ্ছে। বাংলাদেশের সনাতন কয়েকটি সংস্কার যেমন শ্রদ্ধা, বিনয়, পাঠাভ্যাস, নিয়মনিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিকতার প্রচলিত মূল্যবোধ শিক্ষাংগনে অবশিষ্ট নেই বললেই চলে। এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ শুধু নয়- আমাদের কিছু শিক্ষকও ছাত্রদের মাঝে যুক্তির বদলে হিংসাকে বপন করে চলেছেন।

আদর্শিক সংকট

বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে ন্যায়বোধ ও মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবন সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। স্থিতিশীলতার স্বার্থে এই ধরনের মূল্যোবোধের বিকাশ হওয়া দরকার। আর তা না হওয়ার কারণে শিক্ষাংগনে এক নৈতিক বা আদর্শিক সংকট বিরাজ করছে।

সৃজনশীলতা বিকাশের সাথে সাথে সুস্থ মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন নৈতিকতাশ্রয়ী শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু এখানে বাদ সাধছে এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী (?)। মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীন কর্ম উদ্যোগকে রুখার জন্যই নাকি মাধ্যমিক স্তরে ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাঁদের মতে ধর্মাশ্রয়ী শিক্ষা হচ্ছে চিন্তা ও কর্মে প্রাগ্রসরতার পরিপন্থী। তাঁরা আরো মনে করেন এ শিক্ষা ব্যবস্থা পশ্চাৎমুখিতা লালন করে আর কূপমণ্ডুকতা ও বিভ্রান্তির প্রশ্রয় দেয়, তাই ধর্মশিক্ষা পরিত্যাজ্য। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের এ ধরনের অভিযোগ ও কিছু পত্র-পত্রিকার উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে একই সুরে কথা বলা শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের আদর্শিক সংকটের জন্ম দিয়েছে। দুঃখের বিষয় এ ধরনের আদর্শিক শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে ১৯৬১ সালে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আব্দুল মালেককে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের অভিযোগ যে অসাড় এবং অসৎ রাজনৈতিক চিন্তাধারা-প্রসূত তা' বলাই বাহুল্য। এই বিরোধিতা মূলত ইসলামেরই বিরোধিতার জন্য করা হয়ে থাকে। নৈতিকতা তথা ইসলামী শিক্ষা মুক্তচিন্তার সত্যিই পরিপন্থী কিনা আসুন তা একবার বিচার করা যাক।

বিশ্বনবীর মাধ্যমে যে কুরআন আমরা পেয়েছি তাতে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা। জ্ঞানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞান (ওহীর মাধ্যমে), (খ) ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান। আল-কুরআন প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞান হলেও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ নেই। বরং এতে রয়েছে জ্ঞান লাভের প্রচণ্ড তাকিদ। এরই ফলশ্রুতিতে ইসলামের স্বর্ণযুগে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য চিহ্নিত হয়নি। সব রকমের শিক্ষাকেই ধর্মীয় অংগনে স্থান দেয়া হয়। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত ইউরোপীয় লেখক বলেন "ইসলামের এক গৌরবময় কীর্তি হচ্ছে, ইসলাম কুরআন, হাদীস ও মুসলিম বিধান-শাস্ত্র ফিকহ্‌র অধ্যায়ন ও অনুশীলনের অনুরূপ অন্য সব জ্ঞান- বিজ্ঞানের সাধনাকেও সমান আসন ও মর্যাদা দান করেছে এবং মসজিদে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মসজিদে কুরআন, হাদীস ও ফিকহ্‌র ওপর আলোচনার সংগে একইভাবে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ভেষজবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর আলোচনা হতো।

ইসলামে এমন কিছু নেই যা মানুষের প্রকৃতির পরিপন্থী বা মানুষের প্রগতির অন্তরায়। ইসলাম জ্ঞানের

অন্বেষাকে উৎসাহিত করে, কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করে এবং যা কিছু প্রয়োজনীয় তার সব কিছুকে করে বিধিসম্মত। নিষিদ্ধ করে শুধু ক্ষতিকর ও মন্দ কাজকে।

আল-কুরআন মানুষকে প্রাকৃতিক ঘটনা-বৈচিত্র, বায়ুর সতত পরিবর্তনশীল গতি, দিবারাত্রির আবর্তন; মাটি, বাতাস ও পানির উপাদান; জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন, নক্ষত্রখোচিত আকাশ, মহাশূন্যের গ্রহসমূহের সঞ্চারণসহ প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃংখলার ধারা পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করার জন্য তাকিদ দিয়েছে। কেবল কুরআনের বাণীতে নয়, হযরত রাসূল আকরাম (সা) এর বিভিন্ন বাণীতে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন- "বিজ্ঞান ও জ্ঞানের তথ্যাদি ঘন্টাখানেক শ্রবণ করা এক হাজার শহীদের জানাযা থেকেও অধিক পূণ্যের– এক হাজার রাত্রিতে (নফল) নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়েও পবিত্রতর।"

কাজেই জ্ঞানলাভ বা বুদ্ধি চর্চাকে ইসলাম সমর্থন করে না- এ অভিযোগ মিথ্যা। তবে বর্তমান যুগের ভন্ডামি, শঠতা, বিদ্বেষপরায়ণতা ও মুক্ত বুদ্ধির ছদ্মাবরণে অনৈতিকতার নামে আমাদের দেশের এ শ্রেণীর পরজীবী বুদ্ধিজীবী যে বিদ্যাচর্চা মাঝে মধ্যে করেন তাতে দেশ ও দশের মঙ্গল হয় না বিধায় তাকে ইসলাম সমর্থন করে না। প্রিয় নবী বলেছেন "তালাবুল ইলমে ফারিজাতুন" বিদ্যা শিক্ষা করা ফরজ। এ বিদ্যা চুরি বিদ্যা না, নকল করার বিদ্যা না, হাইজ্যাক করার বিদ্যা না, অন্যকে উৎখাত করার বিদ্যা না, লুটপাট করার বিদ্যা না, অন্যায়-অপকর্ম ভন্ডামি- গুন্ডামি-মিথ্যা-শঠতা-প্রবঞ্চনা ও ঘুষ খাওয়ার বিদ্যা না। এই 'ইলম' এমন একটি শব্দ যার অর্থ হলো, এ বিদ্যা শিখলে মানবতার বিকাশ ঘটবে, চরিত্র গঠিত হবে, জীবন সফল, সুন্দর ও সার্থক হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা আমাদের ছেলেদেরকে বাড়ীতেও সে শিক্ষা দিতে পারছি না, আর শিক্ষাংগণেও সে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। পরিবর্তে তাদেরকে দিচ্ছি আদর্শহীন শিক্ষা, নাস্তিকতার শিক্ষা। কমুনিস্টদের গুরু মার্কস বলেন- "ধর্ম মানুষের মন থেকে উৎখাত করতেই হবে।" অবশ্য আল্লাহর কল্পনা মানুষের মন থেকে শত চেষ্টা করে উৎখাত করা সম্ভব হয়নি। বরং মার্কসবাদই মানুষের মন থেকে উৎখাত হয়ে গেছে।

আমরা এখানে বর্তমানের অনৈতিক-দৃষ্টিভংগির সাহায্যকারী হিসাবে আরেকটি দিক তুলে ধরছি। এটি হলো নাস্তিক্যবাদী কিছু শিক্ষকের মনমানসিকতা। নৈতিকতা আশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদী এসব শিক্ষকের আচার-আচরণ থেকে আমাদের শিক্ষাংগণের আদর্শিক সংকটের উৎস সম্পর্কে আঁচ করা যাবে।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আছেন যারা আসলে স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী। এঁরা যেসব বিষয়ের উপর স্বাধীন চিন্তার কসরৎ করেন ইসলাম তাদের মধ্যে প্রধান। এইতো কয়েক বছর আগে জাতীয় জাদুঘরে "স্বদেশ চিন্তা মঞ্চ" আয়োজিত সেমিনারে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে চরম আঘাত হেনে ধৃষ্টতামূলক ইসলাম বিদ্বেষী কথা বলেছেন এ ধরনের এক স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী। তিনি বলেছেন- "একজন আস্তিকের চেয়ে নাস্তিক ভাল। মূর্খতা ও মুসলমানিত্ব একই জিনিষ। প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত ইসলাম টিকে আছে ইতর ও অজ্ঞানদের মাঝে। এরা কিছু বুঝার চেষ্টা না করে শুনে শুনে ইসলামকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কয়জন শিক্ষিত লোক ধর্মে বিশ্বাস করে? আস্তিকেরা পৃথিবীতে এমন খারাপ জিনিষ নেই যা করেনি।" এইভাবে এই জ্ঞানপাপী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান-আকীদার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য রেখেছেন। এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২২ জন শিক্ষকের বিবৃতি এখানে প্রণিধানযোগ্য। "নৈতিকতা বিবর্জিত নৈরাজ্যবাদী আহমদ শরীফ ও তার স্বগোত্রীয় বুদ্ধিজীবী নামধারী কতিপয় ব্যক্তি সব সময়ই বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে হিংসা, ধ্বংস, বিভেদ এবং হানাহানির পরিবেশ সৃষ্টিতে তৎপর রয়েছে।" শিক্ষকবৃন্দ বলেন, "এ উপমহাদেশের যে তিন-চার

জন মনীষী জ্ঞানের জন্য সর্বোচ্চ স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল প্রাইজ লাভ করেছেন সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজ্ঞানী সি.ভি. রমন এবং প্রফেসর আব্দুস সালাম অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ আস্তিক মানুষ। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন, জ্ঞান তাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, দার্শনিক মহাকবি ইকবাল এবং মহাত্মা গান্ধীর মত বরেণ্য পন্ডিত এবং চিন্তাবিদদের সবাই ছিলেন নিজ নিজ ধর্মের প্রতি অবিচল, বিশ্বাস-এ অটল। তাছাড়া খোদ ড. আহমদ শরীফের জ্ঞানগুরু ও আপন চাচা যাঁর বদৌলতে তিনি আজ সভ্য জগতে পরিচিত, সেই বিখ্যাত পুঁথিবিশারদ মৌলবী আব্দুল করীম সাহিত্য বিশারদও একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও আস্তিক ছিলেন। নিশ্চয়ই শরীফের পিতা, চাচা, দাদা, নানা সবাই খাঁটি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মন্তব্য অনুসারে 'পাপী, ইতর, চোর, ঠগ অথবা মূর্খ ছিলেন না। নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক নাগিব মাহফুজও একজন আস্তিক মিসরীয় মুসলমান। নিশ্চয়ই ইতর মূর্খ নন।" এই ব্যক্তিটিকে একশ্রেণীর লোক কালজয়ী পন্ডিত হিসাবে কয়েক বৎসর আগে সাপ্তাহিক পত্রিকা বিচিত্রার এক সংখ্যায় চিত্রিত করে প্রবন্ধ লিখেছেন। এটি এক ইসলাম-বিদ্বেষী ষড়যন্ত্রেরই অংশ বিশেষ। ঐ প্রবন্ধে ডঃ আহমদ শরীফ এর কিছু কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। (সূত্র ঃ প্রফেসর সদরউদ্দিন আহমদ, আহ্বান ১ম বর্ষ, পৃষ্ঠাঃ ৫২-৭৬, ১৯৮৬)। "তিনি সেখানে ক্ষোভের সাথে উল্লেখ করেন যে তাঁর 'প্রতিবাদ' সত্ত্বেও এদেশে ধর্ম প্রবলভাবে আসছে .... আড়ম্বরের সাথে আসছে, আনছে সরকার। কমিউনিজমকে বাধা দেয়ার জন্য, অশিক্ষাকে জিইয়ে রাখার জন্য। এবং মানুষকে অদৃষ্টবাদী করে তোলার জন্য।" এসব কথার মধ্যে ইসলামের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইসলামকে তিনি অশিক্ষা ও অদৃষ্টবাদের সমর্থক এবং ইহজাগতিক উন্নতির পথে বাধা বলে মনে করেন। এক পর্যায়ে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন ঃ "আমি পরকালে বিশ্বাস করি না"। তিনি আরো বলেন ঃ "শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ সবটাই কুসংস্কার।" সোজা কথায়, তিনি ইসলামে বিশ্বাস করেন না। তাঁর নিজের অবিশ্বাস ব্যক্ত করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। যাঁরা ইসলামে বিশ্বাস করেন তাঁদের প্রতি তিনি কটাক্ষ করেছেন। বিজ্ঞানের ছাত্র, শিক্ষকদের একটা বড় অংশ বিজ্ঞানবিরোধী বলে তিনি মনে করেন কারণ "শুক্রবারে তাঁরাই বেশী পরিমাণে মসজিদে যান।" এর একটা ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। সেটা হলো এই যে বিজ্ঞান পড়লে 'মনের বিকাশ' ঘটে না, 'জীবন দৃষ্টি সংকীর্ণ' থেকে যায়। যাঁরা মানব বিদ্যা ও সমাজ বিদ্যা পড়েন তাঁদেরই শুধু মনের বিকাশ ঘটে, জীবন দৃষ্টি প্রসার লাভ করে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর কথার সরলার্থ এই যে যাঁরা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এবং সমাজ বিজ্ঞান চর্চা করেন তাঁরা ধর্মে বিশ্বাস করেন না বা করতে পারেন না।

সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত উল্লেখিত প্রবন্ধের ভাষায় এই 'পন্ডিত বিদ্রোহী', তাঁর নিজের ভাষায় "প্রথম লেখা থেকে আজ পর্যন্ত .... বিশ্বাসের দূর্গে আঘাত করেছেন কারণ বিশ্বাস হচ্ছে যুক্তির অভাব।" কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে তাঁর নিজের জীবন কিন্তু বিশ্বাসহীন নয়। তাঁর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, তিনি বিশ্বাস করেন সমাজতন্ত্রে, বিশ্বাস করেন আধুনিকতায়, বিশ্বাস করেন প্রগতিতে। যুক্তি দিয়ে এ বিশ্বের সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায়, সব সত্যে উপনীত হওয়া যায়- এটাও যুক্তিবাদীদের একটি বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদের বিকাশ ঘটে। যুক্তিবাদীরা ছিলেন জড়বাদী ও নাস্তিক। তাঁদের ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বলেন-

Their materialism, their atheism was a positive belief, not a form of skepticism, it was a definite form of faith, a kind of religion. [ভাবানুবাদ ঃ তাঁদের জড়বাদী দৃষ্টিভংগি, তাঁদের নাস্তিকতায় কোন সন্দেহপরায়ণতা ছিল না। বরং তা ছিল একটা স্থির বিশ্বাস, এক প্রকার ধর্ম।]

নিজেদের যুক্তিবাদী বলে দাবী করলেও বিশ্বাসের আবর্ত থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসতে পারছেন না। এক 'ভূত' তাড়াতে গিয়ে অন্য 'ভূত' তাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসেছে। যুক্তিবাদ এক ধর্ম হিসাবে প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের স্থান দখল করেছে। উল্লেখ্য যে যুক্তিবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে মতের মিল নেই। উদাহরণস্বরূপ, ডেকার্টে (Descartes) যাঁকে যুক্তিবাদের জনক বলা হয়, আস্তিক ছিলেন। মানুষের যুক্তি যত প্রখর ও তীক্ষ্ণ হোক না কেন, তার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতেই হয়।

আমাদের বিজ্ঞানীরা যদি শুক্রবারে বেশী সংখ্যায় মসজিদে যান তার ব্যাখ্যা ওই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর মত এই নয় যে তাঁরা বিজ্ঞান-বিরোধী এবং সংকীর্ণমনা। তার ব্যাখ্যা বরং এই হতে পারে যে বিজ্ঞানের সংগে ইসলামের বিরোধ থাকা দূরের কথা, ইসলাম বিজ্ঞান চর্চার জন্য আহ্বান জানিয়েছে– যে আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলমানরা বর্তমানে বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করছে। কোন মুসলমান বিজ্ঞানী নাস্তিক হতে পারেন না কারণ আল-কুরআন যে আল্লাহর বাণী তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে। তবু তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করি যে বিজ্ঞান পড়লে মনের বিকাশ হয় না বলেই বিজ্ঞানীরা ধার্মিক নন, তাহলে এ কথা কি সত্য যে মানববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার ছাত্ররা ধর্মে বিশ্বাস করেন না কারণ এইসব বিদ্যায় মনের বিকাশ ঘটে, জীবন দৃষ্টি প্রসার লাভ করে? আমরা বহু লোকের নাম উল্লেখ করতে পারি যাঁরা সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন কিন্তু ধর্মকে পরিত্যাগ করেননি।

বস্তুত ঃ মনের বিকাশ ও ধর্মবিশ্বাস পরস্পর বিরোধী হতে পারে না। বরং সত্যিকারের জ্ঞানী ব্যক্তি সন্দেহবাদী বা নাস্তিক হতে পারেন না। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানী প্যাচকাল (Pascal) এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। উদ্ধৃতিটা একটু দীর্ঘ কিন্তু প্রাসংগিক ও মূল্যবান ঃ

There are but three classes of persons : those who have found God and serve Him; those who have not found God, but do deligently seek Him; and those who have not found God, and live without seeking. Him. The first are happy and wise. The second are unhappy but wise. The third are unhappy and fools. (সূত্র ঃ সদরউদ্দিন আহমদ, আহ্বান, ১ম বর্ষ, ১৯৮৬। উপরে উল্লেখিত আলোচনা এই সূত্র থেকে নেয়া হয়েছে।)

এখানে বিজ্ঞান ও আল-কুরআন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে না। শুধু আমাদের দেশের আরেক ইসলাম বিদ্বেষীর কথা আলোচনা করতে যতটুকু বিজ্ঞান আসে ঠিক ততটুকুই আলোচনা করা হবে। কয়েক বছর আগে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক পূর্বাভাসের' ৯ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় জনৈকা তসলিমা নাসরিন স্মৃতিকথা স্টাইলে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই স্মৃতিকথায় লেখিকা কুরআনের আয়াত সম্পর্কে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জঘন্য মিথ্যাচার, বেহেশত ও ইসলামের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কুৎসিত কায়দায় আঘাত হেনেছেন এবং বেশ কয়েক মাস ধরে এদেশের একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় তা বাধাহীনভাবে ইসলাম বিরোধী তৎপরতারই অংশ হিসাবে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা ভাল কাজের পুরস্কারস্বরূপ আমাদেরকে বেহেশত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর এই মহিলা আল্লাহর এই নিয়ামতকে কটাক্ষ করেছেন। তার কাছে বেহেশতের আকর্ষণ নাকি অশ্লীল (?) আকর্ষণ। 'বেহেশতের অশ্লীল (?) আকর্ষণের' জন্য হলেও তিনি নাকি মিথ্যা উচ্চারণ করতে পারবেন না যে--" পৃথিবী স্থির সূর্য ঘুরছে।" তিনি মিথ্যা বলতে চাননি- এটি খুবই নেক কাজ। কেননা ইসলামে মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ- কারণ এতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে অসত্য তথ্য "পৃথিবী স্থির"-একথা কি কুরআনে বলা হয়েছে? না মুসলমানেরা জোর করে তাকে তা কবুল করতে বলেছেন? এসব যাচাই করে দেখা দরকার।

তসলিমা নাসরিন তাঁর লেখায় বেহেশত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে অত্যন্ত জঘণ্য ভাষায় কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন- "ওই মোহময় উদ্যান মরুভূমি-তপ্ত-অতৃপ্ত বহুগামী পুরুষের কাঙ্ক্ষিত হতে পারে, আমার নয়।" তাঁর ভাষায় তিনি একে ওই উদ্যানের অসভ্য আকর্ষণ বলেছেন। এই অসভ্য (?) আকর্ষণে তিনি আকর্ষিত না হতে পারেন, আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে নাস্তিক সাজতে পারেন তাতে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের যায় আসে না। কিন্তু 'মিসকোট' এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে কুরআনের প্রকাশ্য সমালোচনা দ্বারা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আবেগের উপর সরাসরি ছুরি চালনা কেউ সহ্য করবে না। তসলিমা নাসরিন তাঁর স্মৃতিকথায়. নিষিদ্ধ মদিরার কথা উল্লেখ করেছেন। আমার মনে হয় এই মদিরা তাঁর স্নায়ুতন্ত্রকে অকেজো করে ফেলেছে? এবং এজন্য তাঁর পক্ষে কুরআনের বিধৃত তথ্যের বিরুদ্ধে এমন অসভ্য উচ্চারণ করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য-"আমার মা বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলেন। তিনি গ্যালিলিও গ্যালিলেইকে আমার চেয়ে কম কিছু জানেন না। তবু এই যে তাকে আমি নতুন করে সৌরজগত বুঝিয়েছি তা কেবল এই কথাটি স্পষ্ট করে বলবার জন্য যে আমাদের সৌরজগতের সংগে আল্লাহ তাআলার সৌরজগতের কোন মিল নেই।"

কুরআনের আয়াতে বিধৃত সৌরজগতের যে চিত্র পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ ও যথার্থভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেই কি লেখিকা এমন উপসংহারে পৌঁছলেন- প্রশ্ন জাগে বৈকি? কারণ আসমান ও আসমানী বস্তুসমূহের (সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, গ্রহসমূহ) গতি-প্রকৃতি আকাশমণ্ডলীর সংগঠন সবই কুরআনের বর্ণনায় পাওয়া যায়। এক কথায় সৌরজগত সম্পর্কে কুরআনে যে তথ্য রয়েছে সে সব তথ্যের বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে একান্ত হালে- কুরআন নাজিলের প্রায় ১৪শ' বছর পরে। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য। আর তাও কিনা কুরআনে বিবৃত হয়েছে (সূরা ৫১ ঃ ৪৭)। এই কুরআন হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান-সমর্থিত তথ্যজ্ঞানের আশ্চর্যজনক সমাহার। মহাগ্রন্থে এসব ব্যাপারে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবু প্রয়োজনে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। এবার আসা যাক তসলিমা নাসরিনের কথায়। পৃথিবী স্থির না ঘূর্ণনশীল? "তিনিই যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রি, দিবস, চন্দ্র, এবং সূর্য। ইহাদের প্রত্যেকেই পরিভ্রমণরত রয়েছে নিজ নিজ কক্ষপথে- নিজস্ব গতিবেগ সহকারে। অন্য সূরাতে (৩৬ ঃ৪০) বলা হচ্ছে- "সূর্য কখনই ধরতে পারবে না চন্দ্রকে, কিংবা রাত্রি অতিক্রম করতে পারবে না দিবসকে। প্রত্যেকেই পরিভ্রমণরত - নিজ নিজ কক্ষপথে, নিজস্ব গতিবেগ সহকারে।"

কুরআন যে যুগে নাযিল হয় তখন ধারণা করা হতো যে, পৃথিবী স্থির আর সূর্য ঘুরছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বিজ্ঞানী টলেমির আমলে চালু হয় ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদভিত্তিক এই পদ্ধতির ধারণা আর এই মতবাদ জারী থাকে ১৬ শতাব্দীর বিজ্ঞানী কোপারনিকাসের আমল পর্যন্ত। কিন্তু উল্লেখিত আয়াত কিংবা কুরআনের অন্য কোথাও সেকালের প্রচলিত সেই ধারণা (তসলিমা নাসরিনের ধারণার মত) ব্যক্ত হয়নি।

সূর্যের সেই পৃথিবী-কেন্দ্রিক পরিক্রমণের ফলেই যে দিনরাত্রির পালাবদল ঘটছে- সেকালের এই ধারণাটা ছিল একান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং দিনরাত্রির সেই পালাবদলের কথা বলতে গিয়ে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্যের সেই ঘূর্ণন-আবর্তনের কথা এড়িয়ে যাওয়া সেকালে কারো পক্ষে আদৌও কি সম্ভব ছিল? অথচ কুরআনে কোন সময়েই বলা হচ্ছে না যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্যের আবর্তনের ফলেই দিনরাত্রির পালাবদল ঘটছে। এ সম্পর্কে ২/১টি আয়াত তুলে ধরলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে ঃ

"তোমরা কি লক্ষ্য করো না আল্লাহ কিভাবে রাত্রিকে দিনের মধ্যে মিলিয়ে দেন এবং দিনকে মিলিয়ে দেন রাত্রির মধ্যে"- (সূরা ৩১ ঃ ২৯)। "তিনি কুণ্ডলীর মত জড়াইয়া দেন রাত্রিকে দিনের উপর এবং

তিনি দিনকেও কুণ্ডলীর মত জড়াইয়া দেন রাত্রির উপর"- (সূরা ৩৯ ঃ ৫১)। এছাড়া অনুরূপ আরো বহু আয়াত রয়েছে।

উদ্ধৃত আয়াত দুটির ব্যাখ্যা দিলেই পৃথিবীর স্থিরতা সম্পর্কে তাসলিমা নাসরিনের ভুল ভেঙ্গে যাবে বলে আমার বিশ্বাস– অবশ্য তিনি যদি জানার আগ্রহ ও মুক্তমন নিয়ে তার বিচার করেন। এজন্য আমি প্রখ্যাত ফরাসী চিকিৎসক ডঃ মরিস বুকাই-এর "The Bible, the Quran and Science" (অনুবাদ ঃ আখতার-উল-আলম, ১৯৮৮) এ প্রদত্ত সুন্দর ব্যাখ্যা এখানে তুলে ধরছি।

কুরআনের ফরাসী অনুবাদক ব্লাশা-এর মতে, এই আয়াতে ব্যবহৃত আরবী 'কাওয়ারা' শব্দের সর্বোত্তম অনুবাদ হচ্ছে 'কুণ্ডলী পাকানো' বা 'কুণ্ডলী পাকিয়ে জড়ানো'। উক্ত আরবী ক্রিয়াপদের মূল অর্থও হচ্ছে 'কুণ্ডলী পাকানো, পেঁচানো মাথার পাগড়ী যেভাবে পেঁচানো হয়। মোট কথা এ 'কাওয়ারা' শব্দটির অন্য যে কোন অর্থেও এই কুণ্ডলী পাকানো বা পেঁচানো হয়। মোট কথা এই 'কাওয়ারা' শব্দটির অন্য যে কোন অর্থেও এই কুণ্ডলী পাকানো বা পেঁচানো ধারণাটি বিদ্যমান।

সূরা আম্বিয়ার ৩০-৩১ নম্বর আয়াত ও সূরা নাহলের ১৫ নম্বর আয়াতের অর্থ হিসেবে তসলিমা নাসরিন উল্লেখ করেছেন- " তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়।" এ প্রসংগে তসলিমা নাসরিন বলেছেন "নিউটনের মধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা মা জানেন। এই যে আমরা স্তম্ভহীন পৃথিবী থেকে চলে পড়ছি না সেকি পর্বতমালা আমাদের চলে পড়া থেকে আটকাচ্ছে বলে? পর্বত কি আসলেই কারো পতন নিবারণ করে? একবার আকাশ পথে ভ্রমণ করেছিলাম নিরানব্বই মাইল। আমার সেই গোল্লাছুট খেলবার বয়সে, সাত তবক আসমান এফোঁড় ওফোঁড় করে ছুটেছিল আমার বায়বীয় যান, আমি গোপনে গোপনে আকাশে আল্লাহর আরশ খুঁজেছিলাম। মেঘপুঞ্জ ঠেলে ক্রমশঃ উপরে উঠতে উঠতে পৃথিবীর ঘরবাড়ি মানুষ যখন বিন্দু থেকে ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হলো, আমি স্বর্গ নরক খুঁজেছিলাম আকুল দু'চোখে। 'ড্যাডেলাস' তো পালকের ডানা লাগিয়েছিল পিঠে। আমি ডানাওয়ালা যানে সাত আট নয় করে সকল স্তর পেরিয়ে উর্ধে উঠেছি- একি সকল সীমাবদ্ধতার উর্ধ্ব নয়? এটি অতিক্রম করা নয় তাবৎ ক্ষুদ্রতা?"

তসলিমা নাসরিনের মত নমরুদও একসময় আল্লাহর আরশ খুঁজেছিল। তার পরিণতি আমরা জানি। তবে যাক সেসব কথা মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রসংগ টেনে ও আয়াতের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করতে তসলিমা নাসরিন প্রশ্ন রেখেছেন পর্বতমালাই কি স্তম্ভহীন পৃথিবী থেকে আমাদের চলে না পড়ার কারণ। এমনি আরো কত কি?

আল্লাহ তাআলা কুরআনের বহু জায়গায় (৭৮ ঃ ৬-৭, ১৩ ঃ ৩, ৫৩-৫৪, ২৭ ঃ ৬১, ৭৯ ঃ ৩০-৩৩, ১৬ ঃ ১৫ ইত্যাদি) প্রায় একই ধরনের আয়াত নাযিল করেছেন- সবগুলিতে নদী ও পর্বতমালা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। যেমন সূরা রাদে বলা হয়েছে ঃ "(আল্লাহ) তিনিই যিনি বিস্তৃত করেছেন পৃথিবীকে এবং সেখানে পর্বতমালাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুদৃঢ়রূপে এবং নদীসমূহ .... তিনি দিনকে রাত্রির দ্বারা আবৃত করেন। নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তাভাবনা করে।" "তিনিই যিনি পৃথিবীকে বাসস্থান বানিয়েছেন এবং উহার মধ্যবর্তী স্থানে নদী প্রবাহিত করেছেন এবং পর্বতসমূহ স্থাপন করেছেন দৃঢ়ভাবে। তিনি স্থাপন করেছেন প্রতিবন্ধকতা দুই সাগরের মধ্যে। আছে কি কোন সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ ব্যতীত? না, কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই তা জানে না।" এছাড়া অন্যত্র (৭১ ঃ১৯-২০) বলা হয়েছে– "তোমাদের জন্য আল্লাহ পৃথিবীকে কার্পেটের মত বানিয়েছেন যেন তোমরা রাস্তা এবং উপত্যকার সড়ক দিয়ে চলাচল করতে পার"। "পৃথিবী আমরা ইহাকে বিস্তৃত করেছি। কত উত্তমভাবেই

না আমরা তা করেছি"-(৫১ ঃ ৪৮)। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ খুবই উত্তপ্ত এবং তা গলিত ধাতুর আকারে রয়েছে। মানুষ, পশু-পাখীর জীবনধারণের জন্য সে পরিবেশ আদৌ উপযোগী নয়। এখানে যে কার্পেটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে একটি শক্ত আবরণ- পৃথিবীর ভূ-ত্বক। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ভূ-ত্বকের সাধারণ স্থিরতা ও স্থায়িত্বের প্রসংগে বলা হয়েছে। আধুনিক জ্ঞান এ কথাই বলে যে সৃষ্টির আদি পর্যায়ে পৃথিবী ততক্ষণ পর্যন্ত ঠান্ডা হতে পারেনি যতক্ষণ পর্যন্ত তা ছিল অস্থির ও অস্থায়ী। এই স্থিরতায় না আসার কারণে এখনও বহু জায়গায় ভূমিকম্প পর্যন্ত হয়।

এছাড়া সূরা আম্বিয়াতে (২১ ঃ ৩৩) বর্ণিত হয়েছে- "তিনিইতো আল্লাহ, যিনি রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন। সূর্য ও চন্দ্রকে পয়দা করেছেন। সবই এক এক 'কক্ষপথে" সাঁতার কাটছে।" এর তফসিরে (তাফহীমুল কুরআন) বলা হয়েছে মূল আয়াতের 'কুল্লু' (সব) ও 'ইয়াসবাহুনা' (সাঁতার কাটে')- এই দুটি শব্দ "স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এখানে শুধু সূর্য ও চন্দ্রই নয়, অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্রগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় বহু বচনের পরিবর্তে দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহৃত হত। আর সবকিছু পরিক্রমনশীল তা' সাঁতার কাটার সদৃশ বা সমান পর্যায়ভুক্ত। এখানেই মধ্যাকর্ষণ বলের অস্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে।

পৃথিবীতে পর্বতমালার স্থাপন সম্পর্কে আল-কুরআনে বেশি কিছু আয়াত রয়েছে। তসলিমা নাসরিন শুধু একটিই উল্লেখ করেছেন এবং তার সাধারণ অর্থ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে কুরআনের বক্তব্যের সাথে প্রকৃত ঘটনার কোন মিল নেই। সূরা আন-নাহলের (১৬ ঃ ১৫) তফসিরে (তাফহীমুল কুরআন) এভাবে বলা হয়েছে- ভূ-পৃষ্ঠে পর্বতসমূহ উত্থানের আসল ফায়দা এই যে, এর দরুণ পৃথিবীর আবর্তন ও এর গতিশীলতা নিয়মিত ও শৃংখলবদ্ধ হতে পারছে। কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াতেই পর্বতমালার এই কল্যাণের কথাটি নানাভাবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে পর্বতের আর যা কিছু কল্যাণ রয়েছে তা' সব গৌণ ও আনুষংগিক। আসল কল্যাণ হচ্ছে পৃথিবীর স্থিতিশীলতা ও স্থিরতা বজায় রাখা। আর এ জন্যই যে পর্বতমালা গঠিত হয়েছে তা কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের প্রকৃত অর্থ। আধুনিক ভূ-তত্ত্ববিজ্ঞানের স্বীকৃত সত্যের সাথে এ সবের কোন গরমিল লক্ষ্য করা যায় না। পৃথিবীর বুকে পর্বতমালার গঠন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কুরআনের বক্তব্য (৮৮ঃ১৯-২০,৭৮ঃ৬-৭) থেকে এটি স্পষ্ট যে, পৃথিবীপৃষ্ঠে সৃষ্ট ফোল্ড বা ভাজের অস্তিত্ব রয়েছে এবং তা থেকে পর্বতমালা দৃঢ়তা ও স্থিরতা লাভ করে। আধুনিক ভূ-তত্ত্ববিদগণের মতে পৃথিবী-পৃষ্ঠের ভাঁজের উপরে ভিত্তি করে পর্বতমালা দৃঢ়তা ও স্থিরতা লাভ করে। আধুনিক ভূ-তত্ত্ববিগণের মতে পৃথিবী-পৃষ্ঠের ভাঁজের উপরে ভিত্তি করে পর্বত মালা দন্ডায়মান। এসব ভাঁজের মাত্রা ১ থেকে ১০ মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে। এসব ভাঁজ-খাঁজের প্রাকৃতিক অবস্থান থেকেই ভূ-ত্বকের দৃঢ়তা ও স্থিরতা লাভ হয়ে থাকে। এ প্রসংগে কুরআনের আয়াতে (৭৯ ঃ ৩২, ৩১ ঃ ১০, ১৬ ঃ ১৫, ২১ ঃ ৩১) পর্বতমালার উল্লেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এছাড়া কুরআন কোন বিজ্ঞানের পাঠ্যবই নয় যে এতে সবকিছুই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। তবুও খুঁটিবিহীন অবস্থায় বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের পরিক্রমণে কুরআনের বক্তব্যই মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্বই তুলে ধরছে।

তসলিমা নাসরিন ইসলামের বিরুদ্ধে এখনো স্বেচ্ছাচারী উক্তি করে চলেছেন। কতিপয় পত্রিকা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। ইসলাম বিরোধিতার জন্যই তাঁকে প্রতিবেশী দেশ হতে পুরস্কারও দেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আরেক তথাকথিত নেত্রী কয়েক বছর আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য উদ্বোধন করতে গিয়ে মেয়েদের বোরকা এবং মুসলমান পুরুষদের লম্বা লম্বা জামার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনিও তসলিমা নাসরিনের মত তাঁর স্থুল বুদ্ধিতে বলতে পেরেছিলেন যে এদের এক জামা দিয়ে বা বোরকা দিয়ে কয়েক জনের জামা তৈরী করা যাবে।

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার প্রসারে প্রতিবন্ধকতা

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান*

বারো কোটি তৌহিদী জনতার দেশ বাংলাদেশ। ভারত বিভাগের সময় হতেই এদেশের আপামর মুসলিম জনসাধারণের ইচ্ছা আকাংখা ছিল দেশে ইসলামী জীবন বিধান কায়েম হোক। এমনকি দেশের শাসক গোষ্ঠীও পর্যন্ত মাঝে মাঝেই ঘোষণা দিয়েছেন এদেশে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাশ হবে না। কিন্তু মুসলিম জনতার অন্তরের প্রকৃত আকাংখা বাস্তবায়নের জন্যে তাদের কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা তো ছিলই না বরং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফলে এদেশে সেক্যুলার শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের সকল পদক্ষেপ গৃহীত হতে থাকে সরকারীভাবেই। বৃটিশদের রেখে যাওয়া শিক্ষানীতির তেমন কোন পরিবর্তন করা হলো না- না পাকিস্তানী আমলে, না বাংলাদেশী আমলে। ফলে মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করা কোটি কোটি বনি আদম বেড়ে উঠতে থাকলো দিকভ্রান্ত মানুষ হিসাবে। তার সামনে জীবনের কোন লক্ষ্য হাজির রইলো না, বরং পাশ্চাত্যের Eat, Drink and be merry- এর ভোগবাদী দর্শনের প্রতিই সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়লো। তার জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য হয়ে গেল শংকর। তার ধর্মীয় জীবন ও কর্মজীবন হয়ে গেল পৃথক। ধর্মীয় জীবনে মুসলমানের দাবীদার হলেও কর্মজীবনে সে হয়ে গেল পাশ্চাত্যের তথাকথিত সেক্যুলার তথা আকণ্ঠ ভোগের দাসানুদাস। ফলে তার জীবন হতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সা) শিক্ষা হয়ে গেল ক্রম অপসৃয়মান।

এরই বিপরীতে মুষ্টিমেয় মুসলমান ইসলামের শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে রইলো। তারা সকলেই যে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত এমন নয়, বরং পাশ্চাত্যের ধর্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও বেশ কিছু মুসলমান ইসলামী জীবন আদর্শের অনুসারী তো রইলই, উপরন্তু তারা সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনার জন্যে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। মূলতঃ এই ধারার প্রচেষ্টার ফলেই জনগণের, বিশেষতঃ যুবকদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানবার ও এর জীবনাচরণ পালনের প্রতি লক্ষ্যণীয় আগ্রহ দেখা দিতে থাকে। এদেরই প্রচেষ্টার ফলে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনেকেই নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যে হলেও বলতে শুরু করেন Islam is a Complete Code of life- ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের প্রতি এদেশের জনগণের আগ্রহ আরও সক্রিয়ভাবে তীব্রতা অর্জন করে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের নবজাগরণের ফলে। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকাতে মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাশ্চাত্যের জড়বাদী দর্শনের প্রতি সেসব দেশেরই লোকের বিতৃষ্ণা ও বিরাগ ইসলাম সম্বন্ধে নতুন করে জানার ও বোঝার জন্যে কৌতূহলী করে তোলে শিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে। উপরন্তু একদা পরাক্রমশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যেতে থাকে এবং স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের মতো লোকেরা শ্রেণী সংগ্রামের চাইতে সভ্যতার দ্বন্দ্ব, Class struggle এর চাইতে Clash of Civilization -এর কথা স্বীকার করে নিয়ে ইসলামই পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শের প্রতি

* প্রফেসর অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আগামী দিনের অমোঘ চ্যালেঞ্জ হিসাবে স্বীকার করে নেন তখন মুসলিম যুবমানস এক অজানা আনন্দ ও সাফল্যের গর্বে আবেগতাড়িত হয়। কিন্তু নিজের দেশের দিকে সমাজের দিকে তাকিয়ে সে যুগপৎ হতাশ ও বিচ্ছিন্ন বোধ করে। সে দেখে তার শিক্ষা জীবিকা, পরিবার, সংস্কৃতি, রাজনীতির বিরাট অংশেই ইসলাম নেই, বরং রয়েছে ইসলামের প্রতি প্রবল বিরোধিতা। তার তখন মনে হয় সে যেন আপন গৃহেই পরবাসী। এই দোদুল্যমান অবস্থা, চিত্তের এই শংকা কাটিয়ে উঠতে সে খোঁজে শিকড়ের সন্ধান। সে তখন জানতে চায় ইসলামকেই আমূলাগ্র। এভাবেই ধীরে ধীরে জনে জনে বিশাল জনতার সৃষ্টি হয়। তাদের চাপের কাছে, তাদের দাবীর মুখে এদেশের সরকারকেও ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে মৌখিকভাবে হলেও নমনীয় হতে হয়। এরই পথ ধরে ইসলামী অর্থনীতি চর্চারও পথ খুলে যায়।

এক্ষেত্রে অবশ্য দেশের মাদরাসাগুলোর চাইতে বরং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রেক্ষিতে এই উদ্যোগ আরও জোরদার হয়ে ওঠে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ পদ্ধতির সাফল্য, দারিদ্র্য দূরীকরণে ও কর্মসংস্থানে ইসলামের মৌলিক কর্মকৌশলের ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা এই উদ্যোগকে আরও সামনে এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করে। দীর্ঘ দুই দশকের চেষ্টার ফলে আজ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইসলামী অর্থনীতি, যা ইসলামী জীবন বিধানেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ পাঠদানের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এতে উল্লসিত হবার কিছু নেই। বরং এদেশের শিক্ষানীতি চর্চার ও প্রয়োগের পথে রয়েছে হিমালয়প্রমাণ প্রতিবন্ধকতা। সেসব প্রতিবন্ধকতাকে চিহ্নিত করা ও তা অপসারণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো এদেশের শিক্ষানীতি। এদেশের শিক্ষানীতিতে ইসলামী জীবনাদর্শকে ভালভাবে অনুধাবন করারই কোন সুযোগ নেই, ইসলামী অর্থনীতি তো দূরের কথা। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ড. কুদরতই খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে যেমন এদেশের সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের বিরোধিতা করা হয়েছে তেমনি বিরোধিতা করা হয়েছে শামসুল হক শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেও। একথা স্বীকার করতেই হবে প্রবল জনমতের চাপে শেখ মুজিবুর রহমান যেমন কুদরত-ই- খুদা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করতে পারেননি, তেমনি শেখ হাসিনা ওয়াজেদও শামসুল হক কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে পারেননি। এর কারণ সুস্পষ্ট। যাদের সমন্বয়ে এই দুটো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল তারা প্রায় সকলেই সেক্যুলার জীবনাদর্শে বিশ্বাসী। ইসলাম বাস্তবায়নের জন্যে তাঁদের কোন কমিটমেন্ট ছিল না। তাই তাদের রিপোর্ট প্রবলভাবে ইসলামবিরোধী। পক্ষান্তরে এদেশের তৌহিদী জনতা প্রবলভাবেই ইসলামী শিক্ষা তথা জীবনাদর্শের প্রতি অনুরাগী। সে জন্যেই কোন সরকারের আমলেই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টসমূহ বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কিন্তু ইসলামী শিক্ষা তথা ইসলামী অর্থনীতি পঠন-পাঠনের সুযোগকে অবারিত করা যায়নি। শিক্ষানীতিতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই বলেই এমনটি হতে পেরেছে। এর প্রতিবিধানের জন্যে ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের সমন্বয়ে শিক্ষা কমিশন নতুন করে গঠন করে কিভাবে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আদর্শ ও বিশ্বাসের অনুসারী ইসলামকে জানা ও বোঝা যায় তার পদক্ষেপ নিতে হবে। কমপক্ষে সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এ বিষয়ে যথাযথ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তির পদক্ষেপ নেয়া যায়। এজন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? এজন্য অবশ্যই আগ্রহী উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গকে জনমত গঠনের জন্যে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সেইসব পদক্ষেপের মাধ্যমেই সরকারের উপর ক্রমাগত অব্যাহত চাপ দিয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সম্মান ও মাস্টার্স পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে যেটুকু পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে তা অপূর্ণাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোর্সের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও সামঞ্জস্যহীনতাও বিদ্যমান। প্রসংগত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতর যে কোর্স রয়েছে তার সাথে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স সমভাবে তুলনীয় নয়। একইভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান তৃতীয় বর্ষে ইসলামী অর্থনীতি ঐচ্ছিক পত্র হিসাবে থাকলেও ঐ পর্যায়ের কোর্স আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। অর্থনীতির চিন্তাধারার বিকাশে মুসলিম অর্থনীতিবিদদের অবদান সম্পর্কে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে যতটুকু রয়েছে তা দেশের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে নেই। তবুও বলতেই হবে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেই ইসলামী অর্থনীতির পূর্ণাংগ পাঠ নেই। এই অভাব পূরণের ও সমন্বয়হীনতা দূর করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের এক্সপার্টদের বৈঠক ও আলোচনা নিতান্তই জরুরী।

তৃতীয় ঃ এদেশের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়, যা অনেকের কাছে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বলে পরিচিত, ইসলামী অর্থনীতির পাঠদান শুরু হয়েছে অনেক পরে। কিন্তু তারপরেও সে পাঠ যথার্থ অর্থে ইসলামী অর্থনীতির পাঠ নয়, বরং বাংলাদেশের অর্থনীতির পাঠ। এটা খুবই দুঃখের এবং খানিকটা আশ্চর্যের বিষয়ও বটে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত বহু পন্ডিতেরই ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে কোন সুষ্ঠু ধারণা নেই। উপরন্তু, যে সিলেবাস অনুসারে বই লেখা হয়েছে, সে সিলেবাসেও ইসলামী অর্থনীতির প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অনুপস্থিত। আরও দুঃখের বিষয় ইসলামী অর্থনীতির কয়েকটি মৌলিক বিষয় মাদরাসায় পড়ানো হলেও সেসবের অর্থনৈতিক তাৎপর্য ও ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে আলোচনা হয় না বললেই চলে। উদাহরণতঃ সুদ, যাকাত ও ব্যবসা পদ্ধতির কথা বলা যেতে পারে। আল কুরআনে সুদ নিষিদ্ধ, কিন্তু সেই সুদের আর্থ-সামাজিক কুফলগুলো কি এবং কিভাবে মুসলমানরা সুদ ব্যতিরেকেই তাদের আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালাতে পারে তার কোন ধারণাই পাওয়া যাবে না ফাজিল বা কামিল পাশ ছাত্রদের কাছ থেকে। একইভাবে যাকাতের বিষয়ে দীর্ঘ উল্লেখ রয়েছে সহীহ আল-বুখারীতে। কিন্তু কিভাবে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করে সমাজ হতে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকারত্ব মোচন সম্ভব সে সম্বন্ধেও আলোচনা হয় না। 'হেদায়া' নামক বইটিতে ইসলামী রীতি পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের কৌশল সম্বন্ধে ফতওয়া ও মাসায়েল থাকলেও সেগুলো যে আজকের যুগেও প্রয়োগযোগ্য সে ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না। এদেশেই বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ইসলামী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা এসব বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম। কিন্তু এই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিদের বাদ দিলে দেশের প্রচলিত নিউস্কীম বা আলীয়া নিসাবে শিক্ষিত হাজার হাজার ছাত্রর সাথে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইসলামী অর্থনীতির ধ্যান ধারণার ব্যাপারে কোনই পার্থক্য নেই। এই সমস্যা দূর করার জন্যে যথোচিত ও সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে। না হলে দুই ধারার ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে কোন সমন্বয় হবে না। ফলশ্রুতিতে ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ বা ব্যবহার পিছিয়ে যাবে আরও বহু কালের জন্যে।

চতুর্থ যে সমস্যাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে সেটি হলো যথার্থ পাঠ্যপুস্তকের অভাব। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সম্মান পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি যতটুকু পাঠদানের সুযোগ রয়েছে সেটুকুও ছাত্র ছাত্রীরা গ্রহণ করতে পারছে না, শুধুমাত্র মানসম্মত টেক্সট বইয়ের অভাবে। সম্প্রতি দু-তিনটি বই লিখিত হয়েছে এই অভাব পূরণে জন্যে। কিন্তু সেগুলি বাজারে হয় সহজলভ্য নয়, নয়তো বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসকে সামনে রেখে লেখা বলেই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের শিক্ষার্থীদের কাজে আসছে না। ইসলামী অর্থনীতির বই বলতে এদেশে এখনও ইসলামের অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা সম্পর্কে

আল-কুরআন ও সুন্নাহ হতে বাছাই করা আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতির সংকলনকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এ বিষয়ে প্রথম যিনি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নেন তিনি এদেশের ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণার শুধু দিকপালই নন, বরং প্রবাদপুরুষ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম। তাঁর বই 'ইসলামী অর্থনীতি' এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এই বইয়ে তিনি আধুনিক অর্থনীতির ব্যবহার্য টেকনিক ও প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই আল-কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে বর্তমান সময়ের সমস্যা সমাধানের উপযোগী করে তুলে ধরেছেন। ইসলামী অর্থনীতি চর্চায় বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁর এই বইটি মাইলফলক হিসেবে গণ্য হবে। তারপর দীর্ঘদিন যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো আধুনিক অর্থনীতি বইয়ের মাপকাঠিতে ধোপে টেকে না। অতি সম্প্রতি ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে ইংরেজীতে বই লিখেছেন পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যবহৃত টেকনিকের অনুসরণে প্রফেসর এম. এ হামিদ। বইটি বাংলায় অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান। বইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী হলেও কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক বা ডিগ্রী পর্যায়ের ছাত্র ছাত্রীদের উপযোগী নয়। এজন্য উদ্যোগ গ্রহণ এখন সময়ের দাবী। এই স্তরের হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রীর কথা মনে রেখে যথার্থ মানসম্পন্ন ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক বই প্রকাশ খুবই জরুরী। এই উদ্যোগ না নিতে পারলে ইসলামী অর্থনীতির পঠন-পাঠন প্রসারে কাংখিত সাফল্য আসা অসম্ভব।

বাংলাদেশে ইসলামী চর্চার ক্ষেত্রে পঞ্চম যে বাধাটি সবিশেষ গুরুত্বসহ উল্লেখের দাবী রাখে তা হলো আমাদের আরবী ও ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের অভাব। ইসলামী অর্থনীতি চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদপদতার এটি অন্যতম কারণ। ইসলামী অর্থনীতির উপর আরবী ও ইংরেজী ভাষায় গত কুড়ি বছরে শত শত বই রচিত হয়েছে। ফরাসী ও জার্মান ভাষাতেও রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই। আরবী ভাষাতে ইসলামী অর্থনীতির উপর উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে বহু গুরুত্বপূর্ণ বই রচিত হলেও সেসব বই আধুনিক রচনাশৈলী ও বিশ্লেষণাত্মক ধরনের নয়। কিন্তু আকরগ্রন্থ হিসেবে সেগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী অর্থনীতির উপর হাল-আমলে রচিত বইসমূহের মধ্য থেকে বাছাই করা আড়াইশ বইয়ের উল্লেখ রয়েছে "ইসলামী অর্থনীতিঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ" বইয়ে। এসব বই হতে ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয়বিধ প্রসঙ্গেই সম্যক অবহিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা যেমন আরবীতে অদক্ষ তেমনি আরবী ভাষায় শিক্ষিত লোকদের অধিকাংশই ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তিহীন। এজন্যেই এই দুই ভাষাতে যেসব বই ও গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলো ব্যবহার করে বাংলায় মানসম্মত বই রচিত হচ্ছে না। অথচ উচুঁ মানের বই রচনার জন্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ খুবই জরুরী। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যাপকদের মধ্যে যারা বই লিখতে পারেন তাদেরকে ইংরেজী বইয়ের পাশাপাশি আরবী বইগুলো ব্যবহার করতে হবে। তাহলে ঐসব বইয়ের যেমন মান উন্নত হবে তেমনি যুগজিজ্ঞাসার জবাবের সন্নিবেশ ঘটবে। কারণ আরবী ভাষার বইগুলিতে আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে যেসব সমস্যার সমাধান দেয়া আছে সেগুলি এদেশের মুসলমানদেরও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ইসলামী অর্থনীতি যেহেতু শরীয়াহর বিধি-বিধান মান্য করেই প্রয়োগ ও ব্যবহার হবে সেহেতু এই সম্মিলন অপরিহার্য। আমাদের দেশে এই উদ্যোগের বড়ই অভাব। এজন্যেও ইসলামী অর্থনীতির চর্চা গতিবেগ লাভ করছে না।

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ প্রতিবন্ধকতা হলো উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। বারো কোটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ইসলামের অন্যতম ইন্সটিটিউশন যাকাতের আদায় ও বিলি-বন্টন ব্যবস্থা দারুনভাবে অবহেলিত। অথচ উপযুক্তভাবে যাকাতের সম্পদ

আদায় ও তার পরিকল্পিত ব্যবহার হলে একদিকে যেমন দারিদ্র্য বিমোচন সহজ হতে পারতো অন্যদিকে ধনী-গরীবের বৈষম্যও অনেকখানি হ্রাস পেতো। যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। অথচ এদেশে এর চর্চা খুবই অবহেলিত। বহু লোক রয়েছে যারা সাহেবে নিসাব হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করে না। যারাও বা করেন তাদের অনেকেই সঠিক হিসাব করে যাকাত বের করেন না, আবার অনেকেই যাকাতের প্রকৃত হকদারেদের খবরই রাখেন না। উপরন্তু 'উশর আদায় তো এদেশে হয় না বললেই চলে। অঞ্চল বিশেষে কেউ কেউ 'উশর আদায় করলেই সারা দেশে এর কোন প্রভাব পড়ে না। তাই যাকাত ও উশর সূত্রে যে বিপুল অর্থ আদায় হতে পারতো তার উপকার হতে সমগ্র দরিদ্র জনগোষ্ঠীই, হকদার জনগণের ৮০% বঞ্চিত। এক হিসাব মতে বাংলাদেশে শুধু যাকাত খাতেই বার্ষিক দুই হাজার কোটি টাকারও বেশী আদায় হওয়া সম্ভব। অথচ এ ব্যাপারে সরকার যেমন নির্লিপ্ত, তেমনি শিক্ষিতরাও উদাসীন। এর প্রতিবিধান হলে এদেশে ইসলামী অর্থনীতির চর্চা বিপুল সাফল্য বয়ে আনতো।

ইসলামী অর্থনীতি চর্চার সপ্তম প্রতিবন্ধকতা হলো উপযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তীব্র সংকট। ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি চর্চা করতে হলে যেসব ইসলামী কর্মপদ্ধতি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সেসবের মধ্যে মুদারাবা, মুশারাকা ও করযে হাসানা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে সমাজে অভাবী লোকেরই শুধু সাময়িক প্রয়োজন পূরণ হয় তাই না, বরং উদ্যোগী ও কর্মীলোকদের কর্মসংস্থানের উপায় হয় হালাল পদ্ধতিতেই। ইসলামের সোনালী যুগে তো বটেই, আইয়ামে জাহেলিয়ায় ও মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতি চালু ছিল। বর্তমানে সুদের সর্বগ্রাসী প্রকোপ এবং ব্যক্তি চরিত্রের নিদারুণ অবনতির কারণে না করযে হাসানা প্রদান করা যায়, না মুদারাবা ও মুশারাকার উদ্যোগ নেয়া যায়। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া খুবই জরুরী। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী অর্থনীতি চর্চা করার জন্যে চাই ইসলামী জীবনাচরণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসমূহ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও তা পালনের জন্যে আন্তরিক আকাংখা। নইলে শুধুমাত্র মৌখিক সহানুভূতির দ্বারা ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়িত হয়ে যাবে না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আলোচ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ যে প্রতিবন্ধকতা উল্লেখযোগ্য সেটি হলো এদেশের লোকের আবেগপ্রবণতা এবং বাহ্যিক আচরণেই তৃপ্তি। এদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি খুবই তীব্র ও প্রবল। কিন্তু প্রকৃত দীনী শিক্ষার অভাবে এই অনুভূতি বহুলাংশে আবেগবহুল এবং ইসলামের বহিরঙ্গন নিয়েই তৃপ্ত হওয়ার মানসিকতা। খোদায়ী জীবন বিধানের বাস্তব প্রয়োগ করে জীবন ও সমাজকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রঙ্গীণ করার লক্ষ্য তার কাছে গৌণ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই চেতনার অভাবে ইসলামের প্রতি তাদের আবেগতাড়িত অনুভূতিকে সুসংহতভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অথচ ইসলামী অর্থনীতি চর্চার জন্যে সেটাই সবচেয়ে বেশী কাংখিত। বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় বিপুল জনগোষ্ঠীকে ইসলামী জীবন যাপনের জন্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় কর্মতৎপরতা গ্রহণ ও ক্ষেত্রবিশেষে ত্যাগ স্বীকারের দীক্ষায় উজ্জীবিত করতে এবং সুসংহত করে সুগঠিত শক্তিতে রূপান্তর করতে যে উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রয়োজন এই মুহূর্তে তার বড়ই অভাব। এই প্রয়োজন পূরণই বর্তমানে এদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার সবচেয়ে বড় সমস্যা ও বিরাট চ্যালেঞ্জ। এর যথোচিত মুকাবিলা করতে পারলেই কাঙ্খিত মনযিলে মকসুদে পৌছানো সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে আজ সংশ্লিষ্ট সকলকেই তৎপর হতে হবে।

মহাগ্রন্থ আল–কুরআনের পরিচয়

ড: আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী*

যুগে-যুগে আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে কুপথ হতে সুপথে পরিচালিত করার জন্যে বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন। এবং গাইড বুক হিসেবে তাদেরকে সহীফা অথবা গ্রন্থ প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (সা) কে সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব আল-কুরআন নাযিল করেন জিব্রিল ফেরেশতার মাধ্যমে। সুদীর্ঘ তেইশ বছরে আরবী ভাষায় এ গ্রন্থটি নাযিল হয়। আল কুরআনের আবেদন চিরস্থায়ী। কিয়ামত পর্যন্ত এ গ্রন্থটি অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। সামান্যতমও এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটবে না। এ.জেড, এম, শামসুল আলম এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন, Let us think of AL-Quran this background and ponder if a sentence a word or even a vowel sign- jerr, jabar or evrn a point of nakta could be changed.

কেননা আল্লাহ তাআলা নিজেই তাঁর এ গ্রন্থটির হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে, আমিই এ কুরআন অবতরণ করেছি এবং এর হেফাযতের দায়িত্ব আমারই।

আল-কুরআন বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। এর পরিচিতি বিশ্বব্যাপী। বিশ্বের জ্ঞানীগুণী বিভিন্ন মনীষী, পন্ডিত এবং অন্য ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও আল কুরআনের বিভিন্ন দিক, ভাষা এবং গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিম্নে আমরা বিশ্বের জ্ঞানীগুণীদের দৃষ্টিতে আল কুরআনের পরিচয় উল্লেখ করছি।

কুরআনের ভাষাই কুরআনের পরিচয় ঃ

কুরআন ছাড়াও আল-কুরআনের আরো পঞ্চান্নটি নাম উল্লেখ রয়েছে বলে উলুমুল কুরআন বিদ সুয়ূতী স্বীয় আল-ইতকান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর প্রথম পরিচয় হলো এর বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত। বিশ্বের সমস্ত গ্রন্থের চ্যালেঞ্জ দ্ব্যর্থকণ্ঠে ঘোষণা করছে, এটি সেই গ্রন্থ যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পাশ্চাত্য পন্ডিত নিকলসনও দ্ব্যর্থকণ্ঠে এ কথাটি স্বীকার করতে গিয়ে বলেন, In the text as it has come down to us the various reading are few and important and it genueneness is above suspicious -এটি মুমিন মুত্তাকীদের জন্যে হেদায়েত রহমত ও সুসংবাদদাতা। এরশাদ হচ্ছে, কুরআন পথ প্রদর্শন করে তাদেরকে যারা সোজা এবং মুমিনদেরকে দেয় সুসংবাদ। এটি শেফা প্রদানকারী চমৎকার নেয়ামক। এরশাদ হচ্ছে, এ তো শেফা প্রদানকারী এবং মুমিনদের জন্যে রহমত স্বরূপ। নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে এক গোপন কিতাবে, পবিত্রতা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না। এটা বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

১. নবী (সা) এর ভাষায় ঃ কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে রসূল (সা) বলেন, আল্লাহর কিতাব এমন এক গ্রন্থ যাতে রয়েছে পূর্ববর্তীদের ইতিহাস এবং পরবর্তীদের সংবাদ। এ কুরআন মানুষের ফয়সালাকারী ও সত্য মিথ্যার পৃথককারী। এটি উপহাসের বস্তু নয়। দুঃসাহসিকতা বশতঃ যে একে পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তাকে নিগৃহীত করবেন। কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে হেদায়েত অন্বেষণকারীকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করে দেন। আল-কুরআন আল্লাহর শক্ত রজ্জু, স্পষ্ট জ্যোতি, বিজ্ঞানময় সতর্কবাণী ও সরল সঠিক

* সহযোগী অধ্যাপক, আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

পথের পাঞ্জেরী। এটি এমন গ্রন্থ যদ্বারা শত্রুতা বিদূরীত হয়, বচন হয় অসারমুক্ত। অধিক পাঠেও এ পুরাতন হয় না। এর চমৎকারিত্ব সর্বদা বজায় থাকে। যে এর জ্ঞানে জ্ঞানী হয় সে অগ্রগামী হয়। যে এর মাধ্যমে কথা বলে সে সত্যবাদী হয়। যে এর দ্বারা বিচার কার্য পরিচালনা করে সে ন্যায় বিচারক হয়। যে এর আদেশ- নিষেধ অনুযায়ী চলে সে পুরস্কৃত হয়। যে এর দিকে ধাবিত হয় তাকে সে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

২. আলী (রা) এর ভাষায় ঃ আলী (রা) বলেন, আল-কুরআন এমন গ্রন্থ যদ্বারা বাগ্মীর ভাষা ত্রুটিমুক্ত হয়। এর ভিত এতো মজবুত যে কখনো এর স্তম্ভগুলো ধ্বংস হয় না। এটি এমন শক্তি যাকে কোন উপকরাই প্রতিভূত করতে পারে না। এর মাধ্যমেই তোমরা (সঠিক পথ) দেখ সত্য কথা বল এবং সত্য বাণী শ্রবণ কর। পরস্পরে কথা বল এবং একে অপরকে সাক্ষী মান। আল্লাহর বিষয়ে তোমরা কোন মতানৈক্য করো না। কেননা কুরআন পাঠককে আল্লাহর প্রতিপক্ষ বানায় না। তোমাদের উচিৎ আল্লাহর কিতাবকে মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে ধরা। এটি শক্ত রজ্জু, স্পষ্ট জ্যোতি, উপকারী নিয়ামক, সঠিক সিদ্ধান্তদাতা। যে একে আঁকড়িয়ে থাকে তাকে সে নিরাপত্তা দেয়। এর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীকে মুক্তি দেয়। এমন কাকেও শক্ত করে না যাঁকে সোজা করতে হয়। এবং এমন শক্ত করে না যাকে ত্রুটিমুক্ত করে। বারংবার পাঠে এবং শ্রবণেও একে পুরোনো করতে পারে না। যে কুরআনের সাথে কথা বলে সে সত্যবাদী হয়। যে এর হুকুম তামীল করে সে অগ্রগামী হয়। কুরআন এমন উপদেশদাতা যে, কাকে সে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে না। এমন পথ প্রদর্শক যে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে না। এমন বক্তা যে মিথ্যা বলে না। এমন কুরআনের সংস্পর্শে যে আসে সে অতিবঞ্চল অথবা ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকে। চাই সেটা হেদায়েতের অতিরঞ্জন অথবা পথ ভ্রষ্টতার ক্ষতি হোক। কুরআন অবতরণের পর কেউ ভুখা নেই। আর এর অবতরণের পূর্বে কেউ ধনী ছিল না। তোমরা এর অসীলায় রোগমুক্তি কামনা কর। বিপদে সাহায্য প্রার্থনা কর। এটাতো কুফর, নেফাক, গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার মতো বড় বড় রোগের নিয়ামক। এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর কাছে যাঞ্চা করো, এর প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। সৃষ্টির কাছে যাঞ্চা করতে একে অসীলা বানিও না। আল্লাহর সমকক্ষ কারোর দিকে এটি বান্দাকে ধাবিত করে না। কুরআন সবচে বড় শাফায়াতকারী সত্যবাদী বক্তা। কুরআন যার জন্যে শাফায়াত করবে তার শাফায়াত মঞ্জুর করা হবে।

৩. বিভিন্ন মনীষীর দৃষ্টিতে আল-কুরআনের পরিচয় ঃ সু-সাহিত্যিক আবু- উসমান আল-জাহিশ বলেন, কুরআন নাস্তিকদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ, আস্তিকদের জন্যে স্পষ্ট বর্ণনা, হালালের প্রতিষ্ঠাতা, হারামের উচ্ছেদকারী এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী। কুরআন এমন বিচারক- জ্ঞানী মূর্খ সবাই যার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এমন জ্ঞান যার ধ্বংস নেই। এমন মুর্শিদ যে জাহান্নাম থেকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করে থাকে।

৪. খালিদ-ইবন-উকবা বলেন ঃ আল্লাহর কসম নিশ্চয় এ কুরআনে আছে মাধুর্য সম্মোহনী শক্তি, নিশ্চয় এর অভ্যন্তর সন্তুষ্টিদায়ক এবং বহির্ভাগ ফলদায়ক এবং এটি মানুষের রচনা নয়। সুসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক ডঃ ত্বাহা হুসাইন বলেন, এতে সন্দেহ নেই যে, কুরআন আরবী গদ্যের আদি গ্রন্থ। কিন্তু তোমরা এও হয়তো জান যে, কুরআন গদ্য নয়, তদ্রুপ কুরআন কাব্যও নয়। কুরআন কুরআনই, একে অন্য কোন নাম দেয়া যায় না। কুরআন যে কাব্য নয় তা সহজে প্রতিভাত হয়, কারণ কাব্যের বাঁধাধরা ছন্দ এতে অনুপস্থিত। আর কুরআন গদ্য নয় একজন্যে যে এর ষ্টাইল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যা অন্য কোন গদ্য সৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। আয়াতের শেষাংশে বিশেষ নিয়মে সম্পর্কিত। সুরের সুললিত ঝংকারে

আয়াতগুলো মাধুর্যমণ্ডিত। কাজেই কুরআন গদ্য বা পদ্য কোনটিই নয়। আমরা একে গদ্য বা পদ্য বলতে পারি না। কুরআন একটি একক পদ্ধতি অনুপম ও অতুলনীয়। পূর্বেও এমনটি ছিল না এবং পরেও এর তুল্য কিছু হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, কুরআনের ষ্টাইলের অনুকরণ করতে কেউ পারেনি। কাজেই একথা সত্য যে, কুরআনের একটি বিশেষ ষ্টাইল রয়েছে। যার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না।

৫. দার্শনিক কবি আবু আলা আল-মাআররী বলেন ঃ কুরআন মাত্রাযুক্ত গীতিকাব্য নয়। এটি আরবের বক্তৃতার মত নয়। আর না আরবের পণ্ডিত ও গণকদের ছন্দোবদ্ধ বাক্য।

৬. সুলবিদদের মতে কুরআন হলো এমন গ্রন্থ যা মাসাহাফে লিখিত। নিঃসন্দেহে তা থেকে পরম্পরায় রসূলের প্রতি অবতীর্ণ।

৭. মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, বাস্তবিক কুরআন মজীদের পূর্বে আরবীতে কোন সাহিত্য ছিল না; কুরআন মজীদের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃত পক্ষে আরবী এক শক্তিশালী সাহিত্যে ইতিহাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে, কুরআন ব্যতিরেকে আরবী ভাষার অস্তিত্বই পৃথিবীতে বিলুপ্ত হতো।

৮. কুরআনের ইংরেজী অনুবাদক রাডবেল বলেন ঃ আরবের জাহেল, অসভ্য ও বর্বর জাতিকে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী বানিয়ে ছাড়ল।

৯. F. Arbuthant বলেন ঃ সাহিত্যিক দৃষ্টি কোণ থেকে কুরআন হলো আধা পদ্য ও আধা গদ্যের সংমিশ্রণে রচিত বিশুদ্ধতম আরবীর নমুনা।

১০. J. Naish বলেন ঃ মূল আরবী ভূষণে কুরআনের নিজস্ব মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য ও মোহিনী শক্তি আছে। এর বাক্যরীতি সংক্ষিপ্ত ও সমুন্নত এবং এর সংক্ষিপ্ত তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যসমূহ প্রায়শঃ সামিল, সেগুলোর প্রকাশক্ষমতা ও বিস্ফোরক শক্তির অধিকারী।

১১. মিঃ ভুপেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন ঃ কুরআন একটি চিরন্তন আদর্শ। দীর্ঘ তেরশো বছর পরও কুরআনী শিক্ষার প্রভাব এত বেশি শক্তিশালী যে, নীচ বংশের একজন নগন্য লোকও ইসলাম গ্রহন করার পর বড় বড় খান্দানী মুসলমানের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।

১২. জি, এম, রাডউইন তাঁর দি কুরআন গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আল-কুরআন জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার উৎস। একথা মানতেই হবে যে আল্লাহর একত্ব, শক্তি, জ্ঞান এবং সত্যতার যে বর্ণনা আমরা কুরআনে পাই, এ ছাড়া বেহেশত, দোযখ, আকাশ ও পৃথিবী সম্পর্কে অনবদ্য ও সুস্পষ্ট আলোচনার জন্য আমরা কুরআনের যে প্রশংসা করি তা খুবই সামান্য এবং সম্পূর্ণ।

আল-কুরআন উন্নত ও উৎকৃষ্ট চরিত্র শিক্ষার অফুরন্ত ভাণ্ডার। এতে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে সূত্রগুলো বিধৃত রয়েছে, তাতে একথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায় যে, ঐগুলোর উপর ভিত্তি করে শক্তিশালী রাষ্ট্র এমনকি একটি বিশাল সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

১৩. Crichton বলেন ঃ কুরআনের বাক্যসমূহের মধ্যে কবিতার কমনীয় সুরতরঙ্গ আছে। এবং তারা সুদীর্ঘ সাধারণতঃ একটানা ঐক্যতানের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

১৪. Sale বলেন ঃ কুরআনের বাচনভঙ্গি সাধারণতঃ মনোহর ও প্রবহমান এবং অনেক ক্ষেত্রে বিশেষতঃ যেসব স্থানে আল্লাহর মহীমা ও গুণাবলী বিধৃত হয়েছে সে সব অংশ সমুন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট।

১৫. গালমার বলেন ঃ শ্রেষ্ঠ আরব লেখকের কুরআনসম উৎকর্ষ সমন্বিত কোন গ্রন্থ রচনায় কৃতকার্য হতে না পারা বিস্ময়কর নয়।

১৬. ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন ঃ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দুনিয়ার উপর পাপাচারের যে সব আস্তানা পড়েছিলো পবিত্র কুরআন সেসব নির্মূল করলো। পবিত্র কুরআন দুনিয়াকে উন্নত মানবিক চরিত্র, নাগরিক আইন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করলো।

১৭. মান্না খলীল আল-কাত্তানের মতে ঃ কুরআন হলো আল্লাহর এমন বাণী যা মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা নামাযে তিলাওয়াতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১৮. ঐতিহাসিক আহমদ হাসান আযযয়াত বলেন ঃ কুরআন আরবী ভাষায় সংকলিত প্রথম গ্রন্থ যা বিশেষ অলংকারপূর্ণ এবং বিশেষ স্টাইলে অবতীর্ণ। এতে কবিতার মতো কোন ওজন বা মাত্রা এবং কাফিয়া বা অন্তমিল নেই। এটি ছন্দোবদ্ধ গদ্যেও রচিত নয় যা বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা যায়। এটি এমন সরল গদ্যও নয়; যা প্রচলিত রীতিতে রচিত। এতে কোন ছন্দ নেই।

১৯. আল-কুরআনের বিশিষ্ট ইংরেজী অনুবাদক আরবেরী বলেন ঃ আল-কুরআন বিশ্বের মুসলিমদের জন্যে শুধুমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থই না, এটি ক্লাসিক আরবীর প্রধান উৎসও।

২০. J.M. Rodwell বলেন ঃ এটা স্বীকার করতেই হয় যে, আল-কুরআন বিশ্বের বড় বড় ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

২১ J.E. Swaon "The history of world civilization গ্রন্থে বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা) ছিলেন ধর্মীয় গুরু এবং সমাজ সংস্কারক আর আল-কুরআন হলো ধর্মীয় ও আইন গ্রন্থ। ইসলাম হলো বর্তমানে বিশ্বের ডায়নামিক ধর্ম যা বিশ্বের সকল ধর্মের উপর জয়ী হচ্ছে।

২২। ঐতিহাসিক শওকী যায়ফ বলেন ঃ কুরআন এমন গ্রন্থ যার অগ্রে বা পশ্চাতে কোন বাতিল শক্তি তার সমকক্ষ কোন গ্রন্থ রচনা করতে পারেনি। অবতীর্ণ হয়েছে তা রাসূল (সা) এর প্রতি জিব্রীল ফেরেশতার মাধ্যমে, বিজ্ঞানময় প্রশংসিত সত্তার তরফ হতে সুদীর্ঘ তেইশ বছরে ক্রমান্বয়ে।

২৩. মরিস বুকাইলী বলেন ঃ বিষয় বস্তুর পরিপাটি এবং ভাবের গাম্ভির্যে পবিত্র কুরআন সমস্ত আসমানী কিতাবকে ছাড়িয়ে গেছে। অনন্ত প্রভু তাঁর আসমানী অনুগ্রহে মানুষের জন্যে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন পবিত্র কুরআন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট মানুষের মঙ্গল সাধনের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের সুর গ্রীক দর্শনের সুর হতে অনেক উর্ধ্বে। কুরআনের এরূপ তথ্য রহস্য কোনদিনই সেকেলে হবার নয়।

২৪. তিনি আরো বলেন ঃ কুরআনকে সুসঙ্গত ভাবেই বলা যায়, বিজ্ঞানীদের জন্যে একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্যে একটি শব্দকোষ, বৈয়াকরণিকদের জন্য একখানা ব্যাকরণ গ্রন্থ, কবিদের জন্যে একখানা ছন্দ, সংহিতা এবং কানুন ও বিধানের জন্য বিশ্বকোষ। বাস্তবিক কুরআনের পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থই কুরআনের সাথে সমতুল্য নয়।

২৫. De-La-Vinisetto বলেন ঃ ঐহিক ও পারত্রিক ব্যাপারসমূহ কুরআনের ভিত্তিতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। কানুন-বিজ্ঞান, আল্লাহর একত্ব অধিকার, মুক্তির মূলনীতি সমূহ, সামাজিক বিধি-নিষেধ এবং বিচার পদ্ধতি কুরআনের মধ্যে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, কুরআন হলো মুসলমানের ধর্মের সনদ ও শাসনতন্ত্র যা ইহজগতের মানুষের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে এবং পরলোকে তাদের মুক্তির নিশ্চয়তা দান করে।

২৬. চার্লস ফ্রান্স বোড় লিখেছেন ঃ কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। দুনিয়ার তাবৎ গ্রন্থরাজির মধ্যে কোন গ্রন্থকেই কুরআনের সমান অধ্যয়ন করা হয় না। হতে পারে বাইবেলের কপি অধিক বিক্রি হয়। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদীর অগণিত লোক কুরআনের দীর্ঘ আয়াতগুলো দৈনিক অন্তত পাঁচবার তিলাওয়াত করা ঐ সময় থেকে শুরু করেছে, যখন থেকে তারা কথা বলতে শিখেছে।

২৭. মিসরের আখবারুল ওয়াতান পত্রিকায় কর্মরত একজন খৃষ্টান সাংবাদিক বলেন ঃ আল-কুরআন ইহ ও পরকালীন দিগদর্শন। মুসলমানরা যদি শুধু কুরআন ও হাদীস নিয়ে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করে তাহলে এতে তারা ইহ ও পরকালীন মুক্তির পথ অবশ্যই খুঁজে পাবে।

২৮. ড. স্যামুয়েল জনস বলেন ঃ আল-কুরআনের মর্ম ও আবেদন এতই ব্যাপক, সার্বজনীন ও কালজয়ী যে, প্রতি যুগের যাবতীয় শ্লোগান অবলীলায় এর সামনে অনুজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আর বিজন বন, প্রাণহীন মরু, সুসভ্য নগর এবং বিশাল সাম্রাজ্য সর্বত্রই এর আওয়াজ সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষিত হয়।

২৯. ডেভিন রপোর্ট 'মুহাম্মদ এন্ড কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আল-কুরআন মুসলিম জাতির সামগ্রিক জীবন বিধান। পরিবার-সমাজ, রাজনীতি- অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, বিচার ও প্রশাসনসহ সকল ক্ষেত্রে উপযোগী, উন্নত, সার্বজনীন ও কল্যাণকর বিধানাবলী এতে বিদ্যমান। পাশাপাশি এটি একটি ধর্মীয় গ্রন্থও বটে।

৩০. ফরাসী দার্শনিক লিভার জোন বলেন ঃ আল-কুরআন উজ্জ্বল ও বিজ্ঞানময় এক অসাধারণ গ্রন্থ। এতে কোন সন্দেহ সংশয় -এর অবকাশ নেই। কেননা এটা এমন এক ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি সত্য নবী এবং আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।

৩১. ফরাসী গবেষক মসিয়ে লুমিয়র বলেছেন ঃ

আল-কুরআন একটি যুগ-সংস্কারক আদর্শ। যারা ইসলামকে বর্বর ধর্ম বলে থাকে তারা কুরআন মজীদের শিক্ষা ও দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কুরআনের শিক্ষার আলোকেই বর্বর আরবদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছিল। তারা একেকটি সোনালী মানুষে পরিণত হয়েছিল।

৩২. খ্যাতিমান বাঙালী সাহিত্যিক বাবুচন্দ্র পাল লিখেছেন ঃ আল-কুরআন সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পতাকাবাহী। কুরআনের শিক্ষায় হিন্দুদের মত জাতপাতের ব্যবধান নেই, যেখানে কাউকে শুধু কুলীন বা উচ্চ বংশীয় হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।

৩৩. ভারতীয় গবেষক লালা লাজপত রায় বলেছেন ঃ আল-কুরআন আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শিক্ষক। আমি ইসলামকে ভালোবাসি এবং ইসলামের নবীকে মহাপুরুষ বলে জানি। আমি আন্তরিকভাবে কুরআনের চারিত্রিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আচরণগত এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রশংসা করি, ইসলামের শিক্ষার প্রশংসা করি এবং ইসলামের ঐ নৈতিক-বৈশিষ্ট্যকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করি, যা উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর যুগে ছিল।

৩৪. জার্মান কবি ও দার্শনিক গ্যেটে বলেছেন ঃ আল-কুরআন বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক। পবিত্র কুরআনের গুণ হলো এই যে, এর আকর্ষণী শক্তি পর্যায়ক্রমে চিত্তাকর্ষণ করতে থাকে। এক সময় মানুষকে বিস্মিত করে, এরপর সম্মোহিত করে এবং সব শেষে অদ্ভুত এক মনোতরঙ্গে তাঁকে সন্তরন করায়।

৩৫. তিনি আরো বলেন ঃ বিষয়বস্তু লক্ষ্যের সাথে এর বাচনভঙ্গি, সঙ্গতি অনস্থল, ভয়াল সুন্দর, সর্বত্রই যথার্থ মহৎ ..... এ গ্রন্থখানি সর্বযুগেই সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে।

৩৬. Noldeke বলেন ঃ বাচনভঙ্গি ও শৈল্পিক নৈপুন্যের দিক দিয়ে কুরআনের বিভিন্ন অংশ অতুলনীয় মূল্যের দাবীদার।

৩৭. পাদ্রী রেভারেণ্ড জি এম এডওয়েল লিখেন ঃ আল-কুরআনের শিক্ষা মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করেছে। বস্তুতান্ত্রিকতার রাহু থেকে মানুষকে দিয়েছে মুক্তি। একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত এবং তাঁর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষকে রেহাই দিয়েছে শিশু হত্যার মত নৃশংস ও অমানবিক প্রথার কালো অধ্যায় থেকে। মাদক দ্রব্যকে করেছে হারাম। চুরি ডাকাতি খুন ব্যভিচার ইত্যাদি দমনে এমন শাস্তির বিধান দিয়েছে যে, কোন লোক এসব অপরাধ করার মত সাহসই খুঁজে পায় না।

৩৮. "দি উইজডম অব দ্যা কুরআন " গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

প্রাচীন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ আল-কুরআন সৌন্দর্য ও হৃদয়গ্রাহিতার এক মনোরম ক্ষেত্র। এর বর্ণনাশৈলী অত্যন্ত নিখুঁত এবং মনোমুগ্ধকর। ছোট ছোট বাক্যগুলোতে যেন ছন্দ ও কবিতার বিচিত্র সব উদাহরণের সমাহার। পাশাপাশি রয়েছে গযব বা শাস্তির ভয়াবহ ঘোষণা আর বিস্ময়কর নানা ঘটনার বর্ণনা। মোটকথা কুরআনের সঠিক মর্ম ও তাৎপর্যকে কোন ভাষার গন্ডিতে ধারণ করা সত্যই কঠিন।

৩৯. 'বোনাপার্ট এণ্ড ইসলাম' গ্রন্থ থেকে নেপোলিয়নের উক্তি ঃ আল-কুরআন অদ্বিতীয় জীবন বিধান। আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি পৃথিবীর সকল জ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও প্রতিভাধর ব্যক্তিকে একত্র করে কুরআনী শিক্ষার আলোকে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবো। শুধুমাত্র এই শিক্ষাই মানব জাতিকে সন্তোষজনক ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

৪১. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেনঃ আল-কুরআন মানব জগতের সংস্কারক, আধ্যাত্মিক নির্দেশনা এবং জ্ঞানগর্ভ তথ্যে সমৃদ্ধ এক মহাগ্রন্থ, যা মানব সভ্যতায় এক বিস্ময়কর সংস্কার সাধন করেছে। যে সকল মনীষী এর মর্ম এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সন্ধান পেয়েছেন, তাঁরাই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন যে, কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। মানব জীবনের যে কোন সমস্যার কাছে নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, কুরআন তার সমাধান বের করবেই।

৪২. মহাত্মা গান্ধী তাঁর ইয়াং ইন্ডিয়া গ্রন্থে লেখেন ঃ আল-কুরআন একটি ঐশী গ্রন্থ। আমি আল-কুরআনের শিক্ষা ও দর্শনের উপর পড়াশোনা করেছি। একে এশীগ্রন্থ বলে গ্রহণ করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। আমার কাছে এ গ্রন্থের সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট্য হিসাবে এদিকটাকেই বেশি প্রতীয়মান হয়েছে যে, মানব প্রকৃতির সঙ্গে এর বিধানাবলীর আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়।

৪৩. তিনি আরো বলেন ঃ কয়েকবার গভীর মনোযোগের সাথে আমি কুরআন অধ্যয়ন করেছি, সততা ও পথ প্রদর্শনের শিক্ষা সেখানে দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ এবং মোহিত হয়েছি।

৪৩. স্যার উইলিয়াম ম্যুর বলেছেন ঃ

আল-কুরআন অপরিবর্তনীয়। এর কোন অংশ, কোন পরিচ্ছেদ, এমনকি কোন শব্দ বা অক্ষরও এমন শোনা যায়নি যে, কোন সংকলক একে বাদ দিয়েছেন কিংবা কেউ এর মধ্যে কোন নতুন শব্দ বা বাক্য ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এমন নযীর কোথাও পাওয়া যাবে না। যদি এমন কোন ঘটনা হতো, তাহলে অবশ্যই

তা হাদীসের কোন গ্রন্থে পাওয়া যেত। যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর ছোট ছোট উক্তি ও সামান্য ঘটনার কথাও সংরক্ষিত।

৪৪. বিশিষ্ট গবেষক জর্জ মিল লিখেছেন ঃ

আল-কুরআন অলৌকিক গ্রন্থ। নিঃসন্দেহে আল-কুরআন আরবী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। কোন মহামানবের জ্ঞান ও মেধা এই ধরনের গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম নয়। মৃত প্রাণীকে জীবিত করার চেয়েও কঠিন, দুঃসাধ্য ও অলৌকিক এই গ্রন্থ।

৪৫. খৃষ্টান ঐতিহাসিক মিঃ বাড়লে বলেন ঃ আল-কুরআন বিতর্কের ঊর্ধ্বে এটাই একমাত্র গ্রন্থ, যার মধ্যে তেরশো বছরেও কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন সংঘটিত হয়নি। আল-কুরআনের সামনে উপস্থাপন করার মত কোন জ্ঞান ইয়াহুদী এবং খৃষ্ট ধর্মে নেই।

৪৬. জার্মান গবেষক আইকম কী বলত লিখেন ঃ

আল-কুরআন পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং সুশৃংখল জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়। এর উপর আমল করলে যাবতীয় রোগ-ব্যধি এবং জীবাণু সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৪৭. টমাস কারলাইল লিখেছেন ঃ

আমার নিকট এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কুরআনের মধ্যে সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতার গুণাবলী সর্বযুগেই সমভাবে বিদ্যমান এবং এ কথাটি দিবালোকের মত সত্য যে, পৃথিবীতে যদি সুন্দর এবং কল্যাণকর কিছু সৃষ্টি হয়, তবে তা কুরআন থেকেই হতে পারে।

৪৮. Dr. Arnold Twoain : তাঁর প্রিচিং অব ইসলাম গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

আল-কুরআন পূর্ণাঙ্গ বিধানের সমষ্টি। যে বিধানসমূহ কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলো আপন আপন জায়গায় সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ।

৪৯. দার্শনিক জন জেকরেনিক লিখেছেন ঃ

পবিত্র কুরআন একটি সুমহান সভ্যতা ও উন্নত আদর্শবাদের প্রবর্তন করেছে।

উপসংহার ঃ

এতদ আলোচনায় ইহাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল-কুরআন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় গ্রন্থ। এর শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ত্ব অনস্বীকার্য, দলমত নির্বিশেষে যেই একে অধ্যয়ন করেছে সেই এর চমৎকারিত্বে বিমোহিত হয়ে দ্বার্থ কণ্ঠে স্বীকার করেছেন এর চেয়ে সুন্দর গ্রন্থ আর নেই। এটি শুধু একটি ধর্মীয় গ্রন্থই নয় মানব জীবনের সকল দিক ও ভাগের নির্দেশনা প্রদানকারী এক মহামূল্যবান গ্রন্থ।

"ইসলামকে সর্বপ্রকার বাধা ও পরাধীনতার হাত হতে মুক্ত করে তার শাশ্বত, সনাতন ও চিরন্তন বিধানকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করাই আহলে হাদীসদের রাজনীতি।"

ইকামতে দীনের পূর্বশর্ত

ড. মুহাম্মদ মুজাম্মিল আলী*

আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে মনে করি, তাঁদের সকলের উপর নিজ পরিবার ও সমাজে ইকামতে দীন তথা কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা একটি মহান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব থেকে কোন সুস্থ সবল ও বুদ্ধিমানের অব্যাহতি পাবার আদৌ কোন উপায় নেই। নামায প্রতিষ্ঠার দায়িত্বের চেয়েও এ দায়িত্ব অধিক গুরুতর। কারণ এ দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করার মধ্যেই প্রত্যেকের মুসলিম বলে দাবী করার যথার্থতা নিহিত রয়েছে। অথচ এ সুমহান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেই আমরা করছি যতসব অবহেলা। কেউবা করছি এর প্রকাশ্য বিরোধিতা, কেউবা হয়ে আছি অনুভূতিহীন। আবার অনুভূতি সম্পন্নদের মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত পূরণের মারাত্মক অভাব। সবকিছু মিলে ইকামতে দীনের বিষয়টি যেন হয়ে আছে এক কাল্পনিক ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। যাদের এ ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা নেই তাদের কথা বাদই দিলাম, কিন্তু কথা হচ্ছে তাদের নিয়ে– যারা এ ব্যাপারে অনেক ভাবেন। তাঁরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছেন এভাবে কি আদৌ কোনদিন তারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন? না, আমার দৃষ্টিতে তাঁদের পক্ষে তা এভাবে সম্ভব হবে না। হুজুগের তাড়নায় বা পরীক্ষামূলকভাবে জাতির জনমত যদি কোন দিন তাঁদের পক্ষেও যায়, তবুও তারা তা বেশী দিন ধরে রাখতে পারবেন নয়। এর কারণ একটাই। আর তা হচ্ছে-ইকামতে দীনের পূর্বশর্ত তাঁরা পূর্ণ করেননি বা পূর্ণ করতে পারেননি। এবং এ জন্য তাঁদের নিকট বাস্তব কোন পদক্ষেপও নেই। ইকামতে দীনের গোড়ায়ই যদি গলদ থাকে, তবে কি করে তা বাস্তবে রূপ নিবে? তা না হয়ে বরং তা চিরদিনই কল্পনার বস্তু হয়ে থাকবে। যেহেতু ইকামতে দীনের পূর্বশর্ত পূরণের কোন বিকল্প নেই, তাই বক্ষমান প্রবন্ধে এ জন্যে প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত কি, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশা আল্লাহ।

ইকামতে দীনের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত ঃ

প্রথম শর্ত ঃ এ জন্য প্রয়োজন একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখণ্ড। কোথাও কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্ব প্রথম প্রয়োজন হয় এই শর্তের। ইকামতে দীনের বিষয়টিও এ প্রয়োজন থেকে মুক্ত নয়। ইসলামের প্রারম্ভিক ইতিহাসই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। মহানবী (সা)-এর পক্ষে তখনই ইকামতে দীন সম্ভব হয়েছিল যখন স্বল্প আয়তনের ইয়াসরিব নগরী আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিল।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ ঈমান এবং তৃতীয় শর্ত আমলে সালেহ বা সঠিক ও শুদ্ধ কর্ম।

এ দুটি শর্ত ইকামতে দীনের মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। যেখানে এ শর্তদুটো পূর্ণ হবে না সেখানে ইকামতে দীন কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না। কারণ ঈমান ও আমলে সালেহ দ্বারাই সেই সব ব্যক্তিসমষ্টি গঠিত হয়ে থাকে যাদের উপর দীন প্রতিষ্ঠিত হবে। ইকামতে দীনের জন্য ঈমান ও আমলে সালেহ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই মহান আল্লাহ মুসলমানদের এ দুটো গুণে গুণান্বিত হওয়াকে পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ " তোমাদের মধ্য থেকে

* সহকারী অধ্যাপক, আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং আমলে সালেহ্ করেছে আল্লাহ্ তাঁদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাঁদেরকে খেলাফত দান করবেন যেমন খেলাফত দিয়েছিলেন তাঁদের পূর্ববর্তীদেরকে" ।(সূরা আন নূর ঃ ৫৫ ।) এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইকামতে দীনের জন্য ঈমান ও আমলে সালেহ্ হচ্ছে পূর্বশর্ত। ইকামতে দীনের জন্য এ দুটোই হচ্ছে মূল আবশ্যিক বিষয়। স্বাধীন ভূখন্ড ও সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছা থাকাটা এজন্য কোন মৌলিক বিষয় নয়। ঈমান ও আমলে সালেহ্ -এর শর্ত পূর্ণ হলে একটি পরাধীন দেশে ও আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণের ব্যবস্থা করতে পারেন, সেখানে না হলে অন্য কোথাও তা বাস্তবায়িত হতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ্ রাসূল (সা)-কে দেয়া তাঁর এ প্রতিশ্রুতি মদীনায় পূর্ণ করেছিলেন। এক কথায় বলা যায় যে, পৃথিবীতে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রদানের আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য কোন দেশের জনগণের মাঝে ঈমান ও আমলে সালেহ-এর পূর্বশর্ত দুটি যথাযথভাবে পূর্ণ হওয়াটাই আল্লাহর মূল প্রতিপাদ্য। ভূখণ্ডগত শর্তটি আল্লাহর কাছে গৌণ। সকল কালের জন্য এ শর্ত দুটো সমানভাবে প্রযোজ্য। কস্মিনকালেও তা শিথিলযোগ্য নয়। এ শর্ত দুটো পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যেমন রাসূল (সা)-এর যুগের মুসলমানদের হাতে কর্তৃত্ব আসেনি, তেমনি তা কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না।

ঈমান অর্থ কি

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। একজন মুসলিমকে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবাদি, ভাগ্য ও পরকালের উপর আন্তরিক ও মৌখিকভাবে বিশ্বাস ও স্বীকার করেই প্রথমতঃ মুসলিম হওয়ার স্বীকৃতি পেতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ কর্মের মাধ্যমে সে বিশ্বাস ও স্বীকৃতির বাস্তব রূপ দিয়েই সত্যিকার অর্থে একজন মুসলিম হতে হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের লোকেরই আল্লাহর প্রতি মোটামুটিভাবে বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু একজন মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসের মাঝে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করে জ্ঞানগত, হস্তক্ষেপগত, উপাসনাগত ও অভ্যাসগত যাবতীয় শিরকী কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সত্যিকার অর্থে একজন মুমিন হতে হবে। কারণ এ জাতীয় ঈমানই আল্লাহর একান্ত কাম্য এবং ইকামতে দীনের জন্য এ ধরনের খাঁটি ঈমানসর্বস্ব কর্মী বাহিনী থাকাটাই এর পূর্বশর্ত।

আমলে সালেহ্ কি

আমলে সালেহ অর্থ সঠিক ও শুদ্ধ কাজ। এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এতে যেমন রয়েছে চারিত্রিক বিষয়াদি তেমনি তাতে রয়েছে আল্লাহ ও মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদি। কারণ "চরিত্র গুণে একজন মানুষ আল্লাহর নিকট একজন রোযাদার ও তাহাজ্জুদগুজার ব্যক্তির সমমর্যাদা অর্জন করতে পারে"(তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ, বাব নং-৬২, পৃঃ ৩৬৩।) আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদি হচ্ছে তাঁর নির্ধারিত ও অনির্ধারিত উপাসনাসমূহ এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদি হচ্ছে শরী'আতের সে সকল করণীয় ও বর্জনীয় বিধানসমূহ যা মানুষের পরস্পরের কল্যাণ সাধনের জন্য রচনা করা হয়েছে। মানুষের যাবতীয় রকমের কর্মকাণ্ড হবে একেকটি আমলে সালেহ। এটাই শরী'আতের দাবী। এ জন্য প্রয়োজন যাবতীয় রকমের চিন্তা, চেতনা, আনুগত্য ও অনুসরণকে খতম করে কেবলমাত্র রাসূল (সা)-এর নিঃশর্ত আনুগত্য ও অনুসরণ করা । তিনি (সা) যা কিছু করেছেন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বা করতে নির্দেশ করেছেন সেগুলো ঠিক সেভাবেই করা যেভাবে তিনি করেছেন বা করতে বলেছেন। এ ক্ষেত্রে বিন্দু পরিমাণ সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না করা। অন্যথায় তা বিদ'আত হিসেবে পরিগণিত হয়ে পরিত্যাজ্য হতে বাধ্য। যদিও সেই কর্মটি

দেখতে খুবই ভাল ও আকর্ষণীয় বলে অনেকের নিকট মনে হতে হয়।

সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎ কর্মের নিষেধ

আমলে সালেহ-এর মধ্যে সৎ কর্মের আদেশ এবং অসৎ কর্ম থেকে জনগণকে বারণ করা হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজের জন্যই মূলতঃ মুসলিম জাতির অভ্যুদয় হয়েছে। ইকামতে দীনের কর্মীদেরকে এ দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করতে হবে। যারা ঈমান ও আমলে সালেহ -এর পাশাপাশি এ দায়িত্ব পালন করবে তাঁদের পরস্পরের মাঝে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠবে এক ইস্পাত-কঠিন ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ। পার্থিব কোন কারণে তাতে কোন দিন বিন্দু মাত্র ভাটা পড়বে না। অপরদিকে যারা তাঁদের মত হবে না এবং ইকামতে দীনের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করবে, সে সকল জনগণের বিরুদ্ধে তাঁরা ধীরে ধীরে গড়ে তুলবে এক প্রকাশ্য শত্রুতা। প্রয়োজনে এ শত্রুতাভাব পোষণ করতে হবে নিজ আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে। কারণ তাদের আচার-আচরণ প্রমাণ করছে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করছে। তাই এ জাতীয় লোকদের সংগে ইকামতে দীনের কর্মীদের কোন বন্ধুত্ব থাকতে পারে না। এ প্রসংগে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে এই ঃ "যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতিগোষ্ঠী হয়"। সূরা আলমুজাদালাহ ঃ ২২।) তাদের এ অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এ শত্রুতাভাব চলতেই থাকবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই। পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নয়। এ শত্রুতা প্রসংগে মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ "যতদিন তোমরা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না করো, ততোদিন তোমাদের ও আমাদের মাঝে চির শত্রুতা ও ঘৃণার সৃষ্টি হলো"। (সূরা মুমতাহিনা ঃ ৪) আর তাদের সাথে এ ধরনের আচরণ পোষণ করতে হবে এ জন্যে যে, এরা নামে মুসলমান হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা আল্লাহ ও মুসলমানদের শত্রু। তাই এদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ কোন আচরণ দেখানো যাবে না। এ প্রসংগে আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা- যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে-তা অস্বীকার করছে" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১) বস্তুতঃ যারা আল্লাহর দীন চায় না বা নামায রোযা পালন করে থাকলেও আল্লাহর বিধানানুযায়ী দেশ পরিচালিত হোক এটা চায় না, এক্ষেত্রে মানব রচিত বিধানকে অগ্রাধিকার প্রদান করে, প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ প্রদত্ত সেই সত্যকেই অস্বীকার করছে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই এদের সাথে একজন ইকামতে দীনের কর্মীর কোন গোপন সখ্যতা ও বন্ধুত্ব থাকতে পারে না। অতএব সৎ কর্মের আদেশ আর অসৎ কর্ম থেকে বারণের এ গুরুদায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সংগত কারণে ইকামতে দীনের কর্মীর সাথে তাঁর আত্মীয় স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটবে। যে কোন মুহূর্তে তার গাড়ী, বাড়ী , ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি নিজ জীবনটাও ধ্বংসে হওয়ার উপক্রম হবে। এমন অবস্থার মধ্য দিয়েই নিজেকে ইকামতে দীনের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হওয়ার যথার্থ প্রমান দিতে হবে। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ এ জাতীয় কর্মী হওয়ার যথার্থ প্রমাণ দেয়ার পরই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জন্য দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন।

চতুর্থ শর্ত ঃ ঈমান ও আমলে সালেহ এর গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের একামতে দীনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হওয়া।

মানব জীবনের সর্বস্তরে ইসলামের বিধান কায়েম হোক এটা যেমন শয়তানের কাম্য নয়, তেমনি তা মানবরূপী অনেক শয়তানেরও কাম্য নয়। তারা এ ক্ষেত্রে নানা রকমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। তাই

এদের সকল বাধা বিপত্তি দূর করার জন্য ইকামতে দীনের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তারা সংখ্যায় যতই নগণ্য হোক না কেন তাঁরা সংগঠিত হলে আল্লাহর রহমত তাঁদের সহায়ক হতে পারে। ঈমান ও আমলে সালেহ এর গুণে তাঁরা যতই বলিয়ান হোক না কেন, যদি তাঁরা সংগঠিত না হন, তবে কাংখিত লক্ষ্যে তাঁরা কোন দিনই পৌছতে পারবে না। এ জন্যই মহান আল্লাহ দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হবার নির্দেশ করেছেন। এ প্রসংগে তিনি এরশাদ করেন ঃ "তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এক্ষেত্রে তোমরা কোনরূপ মতবিরোধ করো না"। (সূরা আশ-শুরা ঃ ১৩) আমাদের মাঝে সংগত কারণে কোন কোন বিষয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে; কিন্তু ইকামতে দীনের বিষয়টি হবে এর সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। এ নিয়ে আমাদের মাঝে মতবিরোধ থাকা যেমন আল্লাহর কাম্য নয়, অনুরূপভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করাও আল্লাহর কাম্য নয়। কারণ এতে আল্লাহর উপরোক্ত নির্দেশ লজ্ঘিত হবে। মুসলমানদের ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে। ক্ষমতার প্রতি লোভ প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে। শত্রুরা তা দেখে খুশী হবে এবং বিরোধিতা করার শক্তি ও সাহস পাবে। তাই কোন দেশে ইকামতে দীনের কর্মীদের দল থাকবে মাত্র একটাই। মুসলিম জনগণকে ছোট খাটো সকল মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের মাঝে সার্বিক দিক থেকে অধিক যোগ্যতম এক ব্যক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

পঞ্চম শর্ত ঃ জাগতিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া

আমরা এখন একবিংশ শতাব্দিতে একটি উন্নত বিশ্বে বাস করছি। ইকামতে দীনের অর্থ এ নয় যে, আমরা জগতটাকে ঘুরিয়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে নিয়ে যাব। সে সময়ের মানুষেরা যেভাবে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেছে আমরাও ঠিক তাই করবো। না, তা নয়। ইসলাম একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবন বিধান। সঠিক বিজ্ঞানের সাথে নেই এর কোন সংঘর্ষ নেই এর বিধান মানুষকে ইহ ও পারলৌকিক উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দিতে চায়। মধ্য যুগে মুসলমানদের রাজনৈতিক দূরাবস্থার কারণে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে মুসলমানরা পিছিয়ে গেছে। তা না হলে ইসলামের স্বর্ণ যুগে যেমন মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবক, আবিষ্কারক ও শিক্ষক ছিল, তেমনি আজও থাকত। কিন্তু মুসলমানদের কী বদনসীব! যে কাজ তাঁরা শুরু করেছিল, পশ্চিমারা আজ তার পূর্ণতা দান করলো। সে যা-ই হোক, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাথে যেহেতু ইসলামের কোন দ্বন্দ্ব নেই, তাই ইকামতে দীনের কর্মীদের এ বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হতে হবে। নতুবা ইসলামের সঠিক ধারক ও বাহক হতে পারবে না। বরং তাদের অযোগ্যতার কারণে ইসলামী বিধান বর্তমান যুগে বাস্তবায়নের অযোগ্য বলে সাধারণ জনগণের কাছে বিবেচিত হবে।

কোন দেশে উপরোক্ত পাঁচটি শর্ত পূর্ণ হলে বুঝা যাবে যে, সেখানে ইকামতে দীনের পূর্ব শর্ত পূর্ণ হয়েছে। এখন আল্লাহর ইচ্ছা হলে সেখানে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন।

ইকামতে দ্বীন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা

কোন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে যদি ইকামতে দীনের পূর্বশর্ত পাওয়া যায়, তবে সেখানে ইকামতে দীনের বিষয়টি অনেকটা সহজ হতে পারে। তবে ইকামতে দীনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছা থাকা জরুরী নয়। বরং সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণের মাঝে এর পূর্বশর্ত পূর্ণ হলে আল্লাহর ইচ্ছায় সেখানে দীন কায়েম হতে পারে এবং তা নির্ভর করে কর্মীদের নিষ্ঠা, নিরলস প্রচেষ্টা ও বিরামহীন ত্যাগের উপর।

কারণ এ জাতীয় কর্মীগণ সংখ্যায় স্বল্প হলেও অনেক সময় অধিক সংখ্যক বিরোধী শক্তির উপর আল্লাহর সহায়তায় বিজয়ী হতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে।

এ প্রসংগে আল্লাহর বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "অনেক সময় সংখ্যা লঘিষ্ঠ জনগণ আল্লাহর ইচ্ছায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের উপর বিজয়ী হয়"। সূরা আল-বাকারা-২৪৯ এতে প্রমাণিত হয় যে, ইকামতে দীনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামত কোন জরুরী বিষয় নয়।

ইকামতে দীন ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন

ইকামতে দীনের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কোন বিকল্প নেই। তাই বলে ইকামতে দীনের পূর্বশর্ত পূর্ণ করা ছাড়াই অন্য কোন উপায়ে তা অর্জন করা আল্লাহর কাম্য নয়। কেননা এ জাতীয় ক্ষমতা লাভ করা আল্লাহর প্রতিশ্রুত ক্ষমতা প্রদানের বাস্তবতা হতে পারে না। সেজন্য এ ক্ষমতা অর্জনকারীদের দ্বারা ইসলামের স্থায়ী একটি আদর্শ রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার আশা করা যায় না। বরং স্বল্প সময়ের মাঝে ইসলাম বিরোধী শক্তির হাতে এ জাতীয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। ইকামতে দীনের জন্য একদল নিবেদিত কর্মী বাহিনী ও সমর্থক ছাড়াই কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে যদি দীন কায়েম করা যেতো, তবে রাসূল (সা) এ কৌশলের আশ্রয় নিতেন। কিন্তু ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, কুরেশ নৃপতিগণ তাঁকে বাদশাহ বানাবার প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখান করেছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, ইকামতে দীনের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করার পূর্বে যাদের উপর দীন কায়েম করা হবে তাদেরকে ঈমান ও আমলে সালেহ এর গুণে গুণান্বিত করে তৈরী করে নিতে হবে। ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ নাগরিকদের তৈরী করাটা কোন জরুরী বিষয় নয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ যোগ্য নাগরিকদের হাতেও আল্লাহ ইচ্ছা করলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিতে পারেন। মোট কথা ইকামতে দীনের স্বার্থেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের পূর্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক তৈরী করে নিতে হবে এবং এদের ঐকান্তিক ত্যাগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষমতায় যাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এভাবে ক্ষমতায় যেতে পারলে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, এ ক্ষমতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়েই আল্লাহর ক্ষমতা প্রদানের সেই পূর্ব প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা ঘটলো। এ প্রক্রিয়া ব্যতীত অপর কোন পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করে যদি দীন কায়েমের প্রচেষ্টা চালানো হয়, তবে ইসলাম বিরোধী শক্তির ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতার মুখে এ দুর্বল সরকারের অপমৃত্যু ঘটবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই বলা যায়, দীন কায়েমের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনই মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হচ্ছে ক্ষমতায় যাবার পূর্বে তা দীর্ঘ মেয়াদী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক তৈরী করা।

প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও ইকামতে দীন

প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাঝে দোষ ত্রুটি যা-ই থাকুক না কেন তা যদি আপন গতিতে স্বচ্ছতার সাথে চলতো, তা হলে এ পন্থায়ও দীন কায়েমের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবার প্রচেষ্টা চালানো যেতো। এ পদ্ধতিতে ক্ষমতায় যাওয়া কোন কোন দেশে সফল হলেও আমাদের দেশের মত দেশসমূহে তা সম্ভব নয়। কারণ এখানে রয়েছে পেশী শক্তির দৌরাত্ম্য। আরো রয়েছে কালো টাকার ছড়াছড়ির মাধ্যমে ভোট ক্রয়, ভোট চুরি ও কেন্দ্র দখলের রাজনীতি। যে সমাজের মানুষের নীতি নৈতিকতার কোন বালাই নেই, সে সমাজে দীন কায়েমের জন্য প্রচলিত গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতায় যাওয়া সুদুর পরাহত ব্যাপার। তাই বলা যায় দীন কায়েমের জন্য প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে হ্যাঁ, দীন কায়েম করার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত পূরণ করার পর পেশী শক্তির দৌরাত্ম্য ও যে কোন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির হাত থেকে নির্বাচনকে রক্ষা করার মত শক্তি যদি দীন কায়েমের কর্মীদের থাকে, তবে

বাতিলের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়ানোর নিমিত্তে পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্যথায় নয়।

ইকামতে দীন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আমাদের দেশ একটি স্বাধীন মুসলিম প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে দীন কায়েম নেই। এজন্য বহিরাগত বাতিল শক্তি যতটুকু দায়ী এর চেয়ে দেশের মুসলিম জনগণই অধিক পরিমাণে দায়ী। কারণ আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মহল নামে মুসলমান হয়েও প্রকাশ্যে ইসলামের সাথে শত্রুতা রাখেন। আরেক দল রয়েছে যারা শুধু নামায রোযা আর চিল্লা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ইকামতে দীনের জন্য রাজনীতি করার সাথে তাদের শত্রুতা না থাকলেও নিজেরা তা পছন্দ করেন না। করতে কাউকে উৎসাহিতও করেন না। কেউ করলে তার কোন প্রকার সহযোগিতা না করে বরং অনেক সময় নিজেকে বাঁচানোর স্বার্থে তাঁদের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করেন। অপর একদল রয়েছে যারা এক সময় ইসলামের নামে রাজনীতি করাকে হারাম মনে করে থাকলেও এখন তা হালাল মনে করেন। দীন কায়েমের কোন যোগ্যতা তাদের না থাকলেও তারা নিজেদেরকে এর যথার্থ কর্মী জ্ঞান করে কারো সাথে কোন প্রকার লিয়াজো ছাড়াই দীন কায়েম করতে চান। এজন্য আল্লাহ কর্তৃক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি একটি সুদূর পরাহত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইকামতে দীনের জন্য মাঠে ময়দানে যাঁদের প্রত্যক্ষ পদচারণা রয়েছে অধিক, তাঁদের অনেকের মাঝে উপরে বর্ণিত চার প্রকার শিরকের কোন না কোন প্রকার খুঁজলে পাওয়া যাবে। তাঁদের আমলের মাঝে লুকিয়ে আছে নানা রকমের বেদ'আত। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযসহ বিভিন্ন উপাসনা ও অভ্যাসের মাঝে উত্তম বিদ'আতের আবরণ পরে তাঁদের মাঝে বেদ'আত প্রবেশ করে থাকলেও এসব বিষয়ে তাঁদের কোন অনুভূতি নেই। মিলাদের মত একটি রসমকে যেখানে মাওলানা আশরাফ আলী থানভীসহ বড় বড় ইসলামী বিদ্বানগণ একটি বেদ'আতী কর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেখানে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে তালাশ করলে খুব কম সংখ্যক লোকই পাওয়া যাবে যারা এ মিলাদ অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত নন। তাছাড়া সৎ কর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধ করার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও তাঁরা যথাযথভাবে পালন করতে পারেন নি। ফলে ইকামতে দীনের পথে যারা তাঁদের সহযাত্রী নয়, তাদের সাথে তাঁদের চূড়ান্ত পর্যায়ের কোন সংঘর্ষও সৃষ্টি হচ্ছে না। অথচ এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই তাঁদেরকে ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, প্রয়োজনে ইকামতে দীনের শত্রুদের হাতে নিজেদের জান-মাল সহায় সম্পত্তি, গাড়ী বাড়ী ইত্যাদি সব কিছু বিসর্জন দিয়ে ইকামতে দীনের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হওয়ার পরিচয় দিতে হবে। কিন্তু দেখা যায়, তারা কোন কঠিন পরীক্ষা দিতে রাজী নন। তাই ইকামতে দীনের পূর্বশর্ত পূর্ণ করা ছাড়াই প্রচলিত গণতান্ত্রিক পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করে দীন কায়েম করতে চান। সে জন্য প্রকৃত অর্থে ইকামতে দীনের শত্রুদের সাথে তাঁদের কোন শত্রুতা নেই। রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে গিয়ে কিছুটা শত্রুতা প্রকাশ করে থাকলেও অন্যান্য অংগনে পরস্পরের মাঝে এমন সৌহার্দপূর্ণভাব প্রকাশ করতে দেখা যায় যে, মনে হয় যেন তাদের পরস্পরের মাঝে আদৌ কোন শত্রুতা নেই। তাই ইসলাম বিরোধী পরিবারে নিজের কন্যাকে বিবাহ দিতেও তাঁদের অনেকেই কোন অসুবিধা বোধ করেন না। দীন কায়েমের স্বার্থে দীনের শত্রুদের সাথে তাঁদের চূড়ান্ত রকমের শত্রুতা না থাকার ফলে যেমন তাঁদের ঈমানী পরীক্ষা হচ্ছে না, তেমনি তাদের জন্য দেয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রয়োজনীয়

পরিবেশও গড়ে উঠছে না। এমন অবস্থা যতদিন বিরাজ করবে ততোদিন দীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা করা যায় না। কারণ এ জাতীয় আপোসরফাকারী মুসলিম সমাজ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়। তাই দীন কায়েমের জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা প্রকাশের পূর্বে ইকামতে দীনের কর্মীদের ঈমান ও আমল সংশোধনের প্রতি নজর দিতে হবে। এরপর সকল দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এজন্য ঐক্যবদ্ধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, দীন কায়েম হওয়া একটি পূর্ব শর্ত সাপেক্ষ ব্যাপার। এর পূর্ব শর্ত হচ্ছেঃ ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ গঠনের পাশাপাশি কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। ইসলামী বিধানের আলোকে কোথায় যদি এমন জনপদ গঠিত হয়, যারা আল্লাহ তা'আলাকে তাঁদের প্রভু ও কর্তা হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেয়। নিজেদের জীবনের সর্বস্তরে তাঁর বিধান বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর হয়। এর পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারীদের হাতে নিজেদের জান-মালের যে কোন ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হতে তাঁরা সদা প্রস্তুত থাকে। এভাবে যাবতীয় ধরনের যুলুম নির্যাতনের শিকার হয়ে তাঁরা যদি একটি সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরী করতে পারে, তবে সে সমাজেই আল্লাহর ইকামতে দীনের পূর্ব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে পারে। কারণ দীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এটিই আল্লাহর অনুসৃত রীতি বা সুন্নাত। যারা দীন কায়েমের জন্য পূর্বশর্ত পূরণ ছাড়াই প্রচলিত গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতায় যেয়ে ইসলামী বিধান কায়েম করতে চান; প্রকৃতপক্ষে তারা মারাত্মক ভুলের সাথে রয়েছেন। বাতিলের সাথে সমঝোতার পথ পরিহার করে যতদিন তাঁরা ঈমানের বিভিন্ন পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ না হবেন, ততোদিন তাঁদের দ্বারা দীন কায়েম করা সম্ভব হবে না।

> "কিতাব ও সুন্নাতের বিরুদ্ধে যতপ্রকার বিধান, মতবাদ, আইন, থিওরী, ফর্মুলা, প্রোগ্রাম ও ইজম আছে সমস্তই অনাচার ও ফেৎনা। উক্ত ফেৎনা সমূহের মূলোৎপাটন করাই আহলে হাদীসদের বহু বিশ্রুত সংগ্রামের উদ্দেশ্য।"

১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বরের তোহফা

আব্দুল্লাহ আল মাসউদ

পরিচয় ....
দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মাঝে একটি শব্দ।
বালিকণা আর মৃত্তিকার
মাঝে, বিচরণ করে বিদগ্ধ ভাবে।
চারিদিকেই আশরাফুল-মাখলুকাতের প্রতিধ্বনি।
যেন একটিই পরিচয়
শুধু মানুষের।
বিশীর্ণ পৃথিবীর প্রান্তরে
নৈরাজ্যের অন্ধ থাবা;
কিন্তু কেন?
জানো কি তোমার পরিচয়,
হে যুবক!
ঐতিহ্যের জাফরানী রং
তোমার শরীরে আলেয়ার মতো
নিস্পৃহ রাত কাটায়।
তুমি সেরা; কিন্তু
মহান আল্লাহর দাস।
পৃথিবীতে নীল সাওদার
পাঞ্জেরী তুমি;
তোমার বিশ্বাস আর দাসত্বের
একচ্ছত্র প্রভু;
মহান আল্লাহ।
আর পৃথিবীর বুকে চাই
খেলাফত।
খেজুরের সতেজ ছাউনি; তার নীচে
পৃথিবী শাসন।
স্বর্ণালী যাত্রীদের মাঝেই যেন, দীপ্ত জয়;
আল-ইসলাম।
যার বাহক আল-আমিন,
রিসালাতের শ্রেষ্ঠ নায়ক।
অন্ধকারের নিদ্রাকে লুপ্ত
করার প্রয়াসই, যাহার সর্বাঙ্গীন সফলতা।

পারস্য-রোমের দরবারে
তাঁর কল্পনাও, সূর্যের মতো প্রদীপ্ত।
তিনিই মোহাম্মাদ (সা)।
তুমি তার উম্মত; তোমার,
শ্রেষ্ঠ পরিচিতি।
মনুষ্যত্ব ধ্বংসের করাল গ্রাসকে
খোলা আকাশের ঐ পশ্চিমে
জ্যান্ত কবর দাও এখনি।
নগর শকুনের পায়ের
তলায়, আটকে আছে সভ্যতা।
জড়বাদীর মনোবৃত্তিকে
করে দাও বর্জ্য পদার্থের মতন অকেজো।
নিশাচরের আরব্য আস্তিনে,
জাহেলিয়াতের দরজায়; আঘাত হানো হে যুবকেরা।
অস্থি-মজ্জার মতন
মিশে রও তোমার অস্তিত্বে।
আর সেই দুটি ...।
যা পরিচয় তোমার; তৃষিত মরুভূমির মাঝে
পান্থ শিবির; আল কুরআন ও সুন্নাহ।
জ্যোতির্ময় আলোর প্রকাশ।
যা গড়বে, অনন্য সভ্যতার উত্তরসূরী।
খলীফা আর খেলাফতের
এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।
রায়হানার আত্মিক সুধা; আহলুল হাদীস।
মরু ভূমির ধূসর বুকে
ঝড় তোলা সাইমুম;
সাহাবা ও তাবেঈন এর, অনিন্দ উজ্জ্বল
প্রতিচ্ছবি।
রিসালার কাফেলাতে দীপ্ত ঘোড় সাওয়ার।
হে যুবক।
তুমি সেই অতন্দ্র প্রহরী,
অবারিত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী।
শ্লথ হয়ে যাওয়া সূর্যের
নূতন অতিথি।
ভাবতেই হবে;
পৃথিবীর রঙ্গীন মোহতা আর জীর্ণ সভ্যতাই

তোমাকে বাঁধা দিয়েছে। অচীন শান্তির নীড়ে
ফিরে যেতে।
আর যাক্কুম বৃক্ষের দেশে
আহ্বান করে বারবার।
এক অভিশপ্ত বাসস্থান।
তোমাকে ডাকছে ইতিহাস
রক্তীন ইশতেহার নিয়ে।
যাবেনা সেখানে ?
ময়নার কাঁটা গুলো উপড়ে ফেলে
রূপালী সভ্যতার মোড়ক
উন্মোচন করতে। কারণ,
সরাবের ঘোর কেটে, আদম সন্তানেরা অপেক্ষা
করেছে ; বিপ্লব মাখা একটি নূতন সকালকে
বরণ করবে বলে।
তবে সওয়ার হও; আহলুল হাদীসের
বেহেশতি বোরাকে।
আর জেনে নাও, তোমার অতীত;
আরবী অশ্বের ক্ষুরাঘাতে,
বিদায় নেয়, জাহেলিয়াত।
আলোর বিচ্ছুরণে কাঁপলো, কায়সার, কিসরার
নাস্তিক চূড়া; যেখানে
মদীর নেশায় হোঁচট খেয়েছে একদিন
দুস্থ মানবতা।
দরবারে বিছানো হয়েছে, খুনের বদলে খুন
নিংসৃত গালিচা।
সভাসদদের মুখে
তুবড়ী ছোটে রক্তের হোলি খেলা
মাথায়, লাঞ্ছিত
মানবতার মুখ থুবড়ে পড়া, রাজ মুকুটের শোভা।
যবনিকা পড়ে গেল তাতে।
মাত্র একটি সুরের ঝংকারেতে
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"
এটা ছিল অবিরাম
আপোষ হীন সংগ্রাম।
লোহিত সাগরের দিগন্ত
পেরিয়ে; অবশেষে এখানে,

ভারতীয় উপমহাদেশে। বিছিয়ে যাওয়া
শির্কের শেকড় উচ্ছেদন করে ;
সভ্যতার মাঝে দেবানের
সুবাস ছড়াতে।
অতঃপর...
বেনিয়াদের স্বপ্নে ঘুন ধরে;
ভেসে উঠে দুটি দ্বীপ ; রঙ্গীন স্বপ্নের পারিজাত
প্রস্ফুটিত হয়, দিগ থেকে দিগন্তরে।
১৯৪৬ সাল
আল্লামা আব্দুল্লাহীল কাফী
আল-কুরাইশি
স্পর্শ করেন সোনার কাঠি।
উদিত হয় নূতন চাঁদ
নিখিল বঙ্গ আসাম
জমঈয়তে আহলে হাদীস।
কালের বিবর্তনে এসেছে
নূতন সিমুম; পুরানো শ্বাপদের দলেরা
বনাঞ্চল থেকে এসেছিল
পল্লী বুকে
বিশৃংখলার বেসাত নিয়ে।
তবুও আজো নূতন
জমঈয়তে আহলে হাদীস;
বাংলার পবিত্র জাতিসত্তা।
হে যুবক!
তারুণ্যের দীপ্ততা তোমার
ধর্ম ; তুমি অবারিত সবুজের
উজ্জ্বল প্রতীক।
তোমারো চাই শুভ্র মানযিল।
তাইতো উদ্ভাসিত তোমার
স্বপ্নীল ঠিকানা ...।
তারুণ্যের উজ্জ্বল জোয়ার
জমঈয়ত শুব্বানে
আহলে হাদীস বাংলাদেশ।
১৯৮৯ সালের
২৮ ডিসেম্বরের তোহফা।

কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০২ এর প্রতিবেদন

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা আর প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে তাওহীদী যুব কাফেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন সম্প্রতি রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারাদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ-যুবক এতে অংশ গ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অধিবেশন

ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে গত ৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এসম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের শুব্বান বিভাগ-এর পরিচালক অধ্যাপক মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ গযনফর।

প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান, রাজশাহী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন সদস্য ড. মুহাম্মদ আয়হারুদ্দীন।

বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সম্মানিত সহ-সভাপতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ.কে.এম. শামসুল আলম, প্রেস প্রকাশনা ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারী অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহহাব লাবীব, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগপ্রধান অধ্যাপক মাওলানা মোবারক আলী, ইদারাতুল মাসাজিদ ওয়াল মাশারী' আল-খাইরিয়া-এর ঢাকা অফিসের পরিচালক শায়খ আবু আব্দুল্লাহ শরীফ, বাংলাদেশ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর চীফ জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, পুলিশের এস.পি জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমিন, সাউদী দূতাবাসের গণসংযোগ কর্মকর্তা ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী প্রমুখ।

সকাল ৯টায় কারী মুহাম্মদ শফিকুল ইসলামের কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সরল বঙ্গানুবাদ করেন সংগঠনের বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল হাদী। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শুব্বানের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির ভাষণে আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী বলেন ঃ এদেশে অনেক সংগঠন আছে কিন্তু শুব্বানে আহলে হাদীস সেকল সংগঠন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্যান্য সংগঠনে নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া হয় এর সাথে দুনয়াবী স্বার্থ থাকে। সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের জন্য অনেককে জীবন দিতে হয়। কাল টাকার মাধ্যমে ভোট ক্রয় করা হয়, সৃষ্টি হয় সংঘাত-সংঘর্ষ, লবিং-গ্রুপিং। আর নেতারা ক্ষমতায় যেয়ে, কাল টাকার পাহাড় গড়ে তোলে। কিন্তু শুব্বানের নির্বাচন পদ্ধতি ভিন্ন। তারা প্রত্যক্ষ ভোটে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নেতৃত্ব নিরূপন করে। এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তাদের থাকে না। আজ আমরা

দেখতে পাচ্ছি নতুন নতুন সংগঠন সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত- কিন্তু এরা সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে না, কেন তারা সংগঠিত হয়েছে। এসব সংগঠন কোন নেতা বা গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, কিন্তু শুব্বান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর নির্দেশিত পথে একনিষ্ঠভাবে চলার আদর্শ নিয়ে।

আমরা প্রতিনিয়ত গণতন্ত্র-গণতন্ত্র বলে চিৎকার করছি। হোয়াইট হাউস, হোয়াইট হল, এলিসি প্যালেস আরও কত রকমের গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের আহবান জানান হচ্ছে। এর কোনটির আমরা অনুসরণ করছি? প্রকৃতি গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক আমরা ক'জন। আজকাল সব কিছুর অপব্যবহার হচ্ছে, কোথাও কোন নিয়মনীতি নেই। বিদেশী মেহমান যে কথা বলেছেন ঃ الخلو من المعاصى তা বিশেষ ভাবে বিবেচনার করতে হবে। তিনি আমাদের দেশের জনগণকে লক্ষ্য করে কথাটা বললেও গোটা বিশ্বের মানুষের একথা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। আমরা শিক্ষা লাভ করব কিন্তু পাপমুক্ত হতে পারব না, সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। আমরা গুনাহ থেকে মুক্ত হতে পারি না বলে আমাদের ইলম কোন কাজে আসে না।

অতঃপর তিনি শুব্বানের পাঁচদফা কর্মসূচির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে বলেন, এই পাঁচদফা কর্মসূচি নিজেদের জীবনে বাস্তাবায়ন করে আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হতে হবে এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলিল্লার যথার্থ অনুসরণ করার মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করতে হবে। মুহতারাম প্রধান অতিথি জমঈয়ত শুব্বানের নেতা ও কর্মীদেরকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সংগঠনকে আরো সংহত, আরো গতিশীল করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি তাদের সর্বাংগীন উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব জমঈয়ত শুব্বানের পরিচিতির পর্যালোচনা করে শুব্বান নেতা কর্মীদেরকে সংগঠনের কর্মপদ্ধতি, পরিচিতি ও গঠনতন্ত্র অনুসরণে তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য আহবান জানান।

অধ্যাপক এ.কে.এম. শামসুল আলম শুব্বান কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে আল্লাহ আমাদেরকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তার যথার্থ প্রমাণ দিতে হবে। দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব থাকলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ উম্মতের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহহাব লাবীব শুব্বানের কর্ম তৎপরতার ভূয়শী প্রশংসা করেন এবং নবউদ্যমে শুব্বানের কাজকে আরো গতিশীল করার পরামর্শ দেন।

জনাব ইলিয়াস আলী বলেন, মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান জানাতে হলে নিজেকে সত্যের পথযাত্রী হতে হবে। আর সত্যের পথযাত্রীরা জান্নাতের বিনিময়ে নিজের জানমাল উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

অধ্যাপক মোবারক আলী বলেন, আজ যুব সমাজ কুপথে পরিচালিত হয়ে অধঃপতনের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। এই বিপথগামী যুবসমাজকে সুপথে ফিরিয়ে আনতেই শুব্বানের উত্থান। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শুব্বানকে কাজ করতে হবে।

জনাব রহুল আমীন বলেন, আমরা যে দাওয়াতের কাজ করছি একাজ সর্ব প্রথম নিজের বাড়ী থেকে শুরু করতে হবে, তারপর সমাজ তারপর দেশব্যাপী এভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে।

ড. আব্দুল্লাহ ফারুক বলেন, শুব্বান যে গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে আশা করা যায় যে, তারা অচিরেই তাদের লক্ষ্যে পৌছতে পারবে।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক। নব নির্বাচিত দায়িত্বশীলদেরকে পরিচয় করিয়ে দেন অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর।

কাউন্সিল অধিবেশন

আগের দিন ৭ ফেব্রুয়ারী রাত ৯টায় উত্তর যাত্রাবাড়ীস্থ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া মিলনায়তনে শুব্বানের কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক এ.কে.এম. শামসুল আলম, শুব্বানের মুহতারাম পরিচালক অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর এবং মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার মুহতামিম শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী।

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল হাদীর কন্ঠে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। দারসে কুরআন পেশ করেন অধ্যাপক এ.কে.এম. শামসুল আলম।

কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম ২০০২-২০০১ সেশনের সাংগঠনিক ও আর্থিক সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করেন। অতঃপর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুল খালেক সালাফীর পরিচালনায় ২০০২-২০০৪ সেশনের মজলিসে কারারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে শুব্বানের 'সালেহদের' প্রত্যক্ষভোটে ইফতিখারুল আলম মাসউদ সভাপতি এবং মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অতপর ১৩ সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠান শেষে নব-নির্বাচিত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে হেদায়েতী বক্তব্য পেশ করেন অধ্যক্ষ আব্দুল খালেক সালাফী। অধ্যাপক আসাদুল ইসলামের মুনাজাত পরিচালনার মাধ্যমে কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

মজলিসে আমের বিশেষ অধিবেশন

৮ ফেব্রুয়ারী জুমুআর সালাতান্তে শুব্বানের নবনির্বাচিত সভাপতি ইফতিখারুল আলম মাসউদ-এর সভাপতিত্বে মজলিসে আমের বিশেষ অধিবেশন মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া মিলনায়তনে শুরু হয়। অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সভাপতি শুব্বানের উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শক্রমে মজলিসে কারারের নব নির্বাচিত ১৩ জন দায়িত্বশীলের মাঝে দফতর বন্টনের ঘোষনা দেন। দায়িত্ব বন্টন শেষে দায়িত্বশীলদের শপথবাক্য পাঠ করান শুব্বানের পরিচালক অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর।

উন্মুক্ত সাংগঠনিক অধিবেশন

ঐ দিন আসরের সালাতান্তে জেলা/বিশ্ববিদালয় দায়িত্বশীলদের বৈঠক যাত্রাবাড়ীস্থ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে নব নির্বাচিত দায়িত্বশীলদেরকে পরিচয় করিয়ে দেন মুহতারাম পরিচালক। জেলা দায়িত্বশীলগণও নিজ নিজ পরিচয় তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে হেদায়াতী বক্তব্য পেশ করেন শুব্বান পরিচালক অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ গযনফর এছাড়া বক্তব্য রাখেন শুব্বানের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম। নবনির্বাচিত সভাপতি ইফতিখারুল আলম মাসউদের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দুদিন ব্যাপী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

নতুন সেশনের মজলিসে কারার (২০০২-২০০৪)

১. সভাপতি	ঃ	ইফতিখারুল আলম মাসউদ
২. সহ-সভাপতি	ঃ	মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম
৩. সহ-সভাপতি	ঃ	মুহাম্মদ আব্দুল মালেক
৪. কোষাধ্যক্ষ	ঃ	মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম (রিপন)
৫. সাধারণ সম্পাদক	ঃ	মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন
৬. যুগ্ম-সম্পাদক	ঃ	মুহাম্মদ আব্দুর রাকীব
৭. সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ	মুহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ
৮. প্রশিক্ষণ সম্পাদক	ঃ	মুহাম্মদ আলম হোসাইন
৯. প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক	ঃ	মুহাম্মদ গোলাম রহমান
১০. তথ্য-গবেষণা সম্পাদক	ঃ	আব্দুল্লাহিল হাদী
১১. সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক	ঃ	মুহাম্মদ মতিউর রহমান
১২. সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	ঃ	মুহাম্মদ জুলফিকার আলী
১৩. পাঠাগার সম্পাদক	ঃ	মুহাম্মদ মায়সার উদ্দীন
১৪. বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক	ঃ	মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
১৫. দফতর সম্পাদক	ঃ	মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম

সদস্য বৃন্দ ঃ

মাননীয় প্রধান পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক মনোনীত (৫জন)

১৬.	ঃ	
১৭.	ঃ	
১৮.	ঃ	
১৯.	ঃ	
২০.	ঃ	

মুহতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত (৩জন)

২১.	ঃ	মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
২২.	ঃ	হাফেয মুহাম্মদ আকীল
২৩.	ঃ	

আমাদের পরিচয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামাত দিবসে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আদম সন্তানকে তার পা সরাতে দেয়া হবে না। তা হলো ঃ তার জীবন সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে, তার যৌবন কোন কাজে ব্যয় করেছে, তার সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কোন কাজে তা ব্যয় করেছে এবং তার 'ইলম অনুসারে সে আমল করেছে কি-না।' -তিরমিযী

হে যুবক, তোমার পরিচয় জানো কি!

সৃষ্টির সেরা, কিন্তু মহান আল্লাহর দাস

মহান আল্লাহর সুন্দরতম সৃষ্টি মানুষ। বিশ্বের সব আয়োজন, সব নি'মাত এই মানুষেরই প্রয়োজনে। বিনিময়ে মহান আল্লাহর 'ইবাদাত করাই তার মৌলিক কাজ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا خلقت الجن والإنس الا ليعبدون -

"আর আমি (আল্লাহ) মানুষ ও জিন জাতিকে কেবল আমার 'ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্-যারিয়াত্, আয়াতঃ ৫৬)

পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি

মানুষের আর একটি গর্বিত কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ পরিচয় হলো, সে 'আল্লাহর প্রতিনিধি'। ব্যক্তি ও সমাজের সর্বস্তরে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের যথাযথ অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন তার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। বস্তুত এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের উপরই নির্ভর করছে আমাদের ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন সাফল্য।

শ্রেষ্ঠ নাবী (সা)'র উম্মাত, শ্রেষ্ঠ জাতির সদস্য

মানবতার শিক্ষক নাবী রাসূলগণ (আ) যুগে যুগে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার এ মহান দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। সে ধারাবাহিকতায় সর্বকালের সেরা মানুষ আমাদের প্রিয়নাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি পূর্ণাঙ্গ এক জীবনব্যবস্থা আল-ইসলাম। আর এ দীন কবুল করে মধ্যমপন্থী উম্মাতে মুহাম্মাদী সর্বকালের সেরা জাতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله -

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যই তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা সৎকাজের আদেশ দান করো, অসৎ কাজে বাধা দান করো এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।" (সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১১০)

কর্মনীতি ঃ ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর বিধান অনুসরণ

বস্তুত এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং কুরআন সুন্নাহর খালেস অনুসরণ। মহান আল্লাহর নির্দেশও এটাই ঃ

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا -

"আর তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩)

কর্মপদ্ধতি ঃ কুরআন এবং সুন্নাহ

বিদায় হাজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মহানবী (সা) মুসলমানদেরকে এ চিরন্তন পথ নির্দেশনার কথাই পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দেন ঃ

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله -

"আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ তোমরা এ দুটিকে আঁকড়ে থাকবে, ততক্ষন পর্যন্ত তোমরা বিভ্রান্ত হবে না। সে দুটি জিনিস হলো-আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।" (মুয়াত্তা মালেক)

এক অনন্য সভ্যতার উত্তরসূরী

বস্তুত কুরআন এবং সুন্নাহ-এ দুটি মহাসনদের নিঃশর্ত অনুসরণেই ইসলাম। মহানাবী (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগে মুসলিম জাতি এ দুটি তুহফার যথাযথ সমাদরের মাধ্যমে জাগতিক এবং আত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছিল। তাওহীদ এবং সুন্নাহকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা করেছিল বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য এবং গৌরবোজ্জ্বল এক সভ্যতা। আমরা সেই সভ্যতারই উত্তরসূরী।

আহলুল হাদীস ঃ দীনে হাক্কের অতন্দ্র প্রহরী

আহলুল হাদীস বা আহলে হাদীস অর্থ কুরআন ও হাদীসের অনুসারী। এরা মুসলমানদের মধ্যে সেই সত্যপন্থী দল যারা কুরআন ও সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ এবং এ দুই মূল উৎসকে মানব রচিত সকল মতবাদের উপরে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেঈন-এর আদর্শ অনুসরণ করে তা আকীদা, ইবাদাত, মু'আমালাত, আখলাক, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। দীনের উসূল ও শাখা সকল ক্ষেত্রেই তারা কুরআন-সুন্নাহর উপর অবিচল থাকে।

আহলে হাদীসরা নাবী (সা) থেকে লব্ধ ইলম অন্যের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করছে এবং এ বিষয়ে তারা চরমপন্থীদের অনভিপ্রেত পরিবর্তন, বাতিলপন্থীদের অন্যায় সংযোজন ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা প্রতিহত করে। ইসলামী চিন্তাবিদদের নিকট এরা কখনও আহলুল হাদীস, কখনও আসহাবুল হাদীস, আবার কখনও মুহাম্মাদী বা সালাফী নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

তোমাকে ভাবতেই হবে

এ পৃথিবী তোমার আসল ঠিকানা নয়। মৃত্যুর পর আখিরাতের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবে। হাশরের ময়দানে, ভয়াবহ বিচার দিবসে মহান আল্লাহর নিকট হিসাব দিতে হবে প্রতিটি কাজের। সেদিন নিজের সৎকর্ম ব্যতীত কোন কিছু কারো কোন উপকারে আসবে না। সৎকর্মশীলরা লাভ করবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সেই সাথে চিরশান্তির সুখের নীড় জান্নাত। কিন্তু দুষ্কর্মশীলরা পাবে চিরঅভিশপ্ত নিকৃষ্টতম ভয়াবহ বাসস্থান জাহান্নাম। সেই জগতে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগৃহীত হয়েছে কি?

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এক ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা

শির্ক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন করত মানবরচিত মতবাদের উপর ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে সকল যুগে, সকল দেশে আহলে হাদীসদের সংগ্রাম ছিল অবিরাম, আপোষহীন। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর ১৯০৬ সালে জন্ম নেয় অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্স নামে সর্বভারতীয় তাওহীদী সংগঠন। এদিকে বাংলাদেশের বিশিষ্ট আহলে হাদীস আলেমদের সমবেত প্রচেষ্টায় ১৯১৪ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'আঞ্জুমানে আহলে হাদীস, বাঙ্গালা। পরে এর সাথে আসামকেও সংযুক্ত করা হয়। অপর দিকে ইংরেজ শাসনের অবসান, দেশ-বিভাগ ও নবরাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে অসাধারণ প্রতিভা এবং বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী আল্লামা মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)-র নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে গঠিত হয় নিখিল-বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস। বর্তমানে এই সংগঠনটিই বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস নামে এদেশে দীর্ঘদিন যাবত আহলে হাদীস আন্দোলন পরিচালনা করে যাচ্ছে। এই সংগঠনেরই একমাত্র অনুমোদিত এবং স্বীকৃত যুবসংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

আরবী শাব্দুন (যুবক) শব্দের বহুবচন 'শুব্বান'। ১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বংশাল জামে মসজিদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত ছাত্র, যুবক ও তরুণদের এক কনভেনশনে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। রাজধানী ঢাকার নবাবপুর রোডে এর কেন্দ্রীয় দফতর। উল্লেখ্য, ৫০'র দশক থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা আহলে হাদীস ছাত্র-যুব সংগঠন সমূহের সম্মিলিত এবং স্বীকৃত জাতীয় রূপই হল জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী

লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঃ কালেমা তাইয়েবাকে যথাযথ উপলব্ধি করত জীবনের সর্বস্তরে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শুব্বানের রয়েছে পাঁচ দফা কর্মসূচীঃ

ক. ইসলাহুল আকীদাহ্ বা আকীদাহ সংশোধন ঃ তাওহীদ ও রিসালাতে মুহাম্মদী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন ও অনুশীলন, খালেস ইবাদতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে নাবী মুহাম্মদ (সা) ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব মনে প্রাণে ও বাস্তবে গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করা।

খ. আদ্ দা'ওয়াহ্ ওয়াত তাবলীগ বা আহবান ও প্রচার ঃ ছাত্র ও যুব সমাজের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া এবং তাদেরকে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা।

গ. তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ঃ ইসলামী সমাজ ও জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র ও যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করা।

ঘ. আত্ তাদরীব ওয়াত্ তারবিয়াহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ ঃ যুবশক্তিকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান, শিরক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন এবং এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যোগ্য আহলে হাদীস কর্মী গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃত্বে আহলে হাদীস আন্দোলনকে সমাজের সর্বস্তরে সম্প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

ঙ. ইসলাহুল মুজতামা' বা সমাজ সংস্কার ঃ যাবতীয় অনৈসলামী রীতিনীতি ও অপসংস্কৃতি প্রতিহত

করে কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো।

আমাদের কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ মহানাবী (সা)-এর অনুসৃত হেকমতপূর্ণ এবং স্বাভাবিক পন্থায় কর্মতৎপর। চরমপন্থা কিংবা আপোষকামিতা নয়; মধ্যমপন্থাই শুব্বানের সাংগঠনিক পলিসি। সেই সাথে সৎ এবং যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির লক্ষ্যে কর্মীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা স্তরভিত্তিক মানোন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

শুব্বানের কর্মী স্তর চার পর্যায়ের- প্রথম স্তর রাগেব (অনুরাগী),দ্বিতীয় স্তর 'আরেফ (সচেতন), তৃতীয় স্তর সালেক (অভিযাত্রী) এবং চতুর্থ তথা সর্বোচ্চ স্তর হলো সালেহ (নিষ্ঠাবান)। মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে সিলেবাসের আলোকে জ্ঞানগত এবং ব্যবহারিক উভয় দিকের ক্রমোন্নতি বিবেচনা করা হয়। এই সংগঠনের সাংগঠনিক স্তরও চার পর্যায়ের- শাখা, উপজেলা, থানা, জেলা এবং কেন্দ্র।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রণীত সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি এবং সিলেবাসের ভিত্তিতে শুব্বানের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ইসলামের বিশেষ কোন দিক বা বিভাগ নয় বরং পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুসরণের লক্ষ্যে শুব্বান কাজ করে যাচ্ছে। সেই সাথে সকল ইসলামী সংগঠন বা সংস্থার সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ়করণেও আমরা সর্বদাই সচেষ্ট।

আমাদের আন্দোলন শিকড়সন্ধানী। শুধু বিজাতীয় মতবাদ নয়; মুসলিম সমাজে প্রচলিত অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটনেও আমাদের সংগ্রাম আপোষহীন।

আমাদের আহ্বান

ঘটনাবহুল দুটি সহস্রাব্দ পেরিয়ে বিশ্ববাসী আজ এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গগনস্পর্শী অগ্রগতির ফলে পৃথিবী বস্তুগত উৎকর্ষে সমৃদ্ধ হলেও বিশ্বমানবতা আধ্যাত্মিক সংকটে পর্যুদস্ত। পাশ্চাত্যের সেক্যুলার জীবনদর্শন ও সম্ভোগবাদী সংস্কৃতিই এ জন্য দায়ী। এ অবস্থার অবসানকল্পে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে কুরআন-সুন্নাহর বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশে দেশে চলছে সালাফী আন্দোলন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃত্বে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ সেই একই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। দেশে দেশে ইসলামী পুনর্জাগরণের যে ঢেউ আজ বিশ্ববাসীকে শান্তির পথে, কল্যাণের পথে, সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে আহ্বান জানাচ্ছে, সেই স্রোতধারায়, আমাদের কাফেলায় শামিল হওয়ার জন্য আমরা দেশের সকল ছাত্র-যুবককে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে হলে আরও পড়ুন

১. শুব্বানের গঠনতন্ত্র

২. কর্মপদ্ধতি

৩. আহলে হাদীস পরিচিতি ঃ আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রঃ)

৪. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, স্মরণিকা '৯২, '৯৯

৫. সাপ্তাহিক আরাফাত

৬. জমঈয়ত কর্তৃক প্রকাশিত বই-পত্র, সাময়িকী ইত্যাদি।

كبيراً، فنظام الحياة الغربي العلماني والثقافة المادية تعود اليه المسئولية لهذا الانحطاط

فإنقاذاً من هذه الحالة الخطيرة تواصل الحركة السلفية جهودها في كل بلد من البلاد بتنفيذ الشرع في جميع مراحل حياة الفرد والمجتمع والبلاد فتبذل جمعية الشبان نفس هذه الخدمات والجهود في وطننا العزيز بنغلاديش تحت إشراف جمعية أهل الحديث بنغلاديش.

فنتوجه إلى الطلبة الشباب بالدعوة المخلصة والنداء العام للإسهام في تيار النهضة الإسلامية التي تدعو الناس جميعا بصراحة إلى الأمن والسلامة والصراط المستقيم.

ومن يرغب التفصيل عن جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش فعليه أن يطالع الكتب التالية بدقة:

١- دستور جمعية الشبان

٢- جدول الأعمال لجمعية الشبان

٣- تعريف بأهل الحديث للعلامة محمد عبدالله الكافي القرشي

٤- تذكار جمعية أهل الحديث الصادرة سنة ١٩٩٢ م و ١٩٩٩ م

٥. مجلة عرفات الاسبوعية

٦. الكتب و المجلات الصادرة جمعية أهل الحديث بنغلاديش

الناشر : قسم الطبع والنشر لجمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش، ١٧٦ شارع نواب فور داكا - ١١٠٠ التلفون والفاكس : ٩٥٦٦٧٠٥

«أهل الحديث ليس اسم حزب أو فرقة معينة ولكن نشؤها لإزالة التفرقة بين المسلمين وتوحيدهم كافة واحدة واسعة النطاق».

العلامة محمد عبد الله الكافي رحمه الله

مصدر العمل : القران والسنة :

وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا يوم حجة الوداع فى خطبته التار يخية بقوله البليغ ـ "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله" (مؤطا الإمام مالك رح)

وارث الحضارة الرائعة :

وللإسلام مصدران أساسيان وهما القران والسنة وقد بلغت الأمة قمة التطور المادى والروحى باتباع هذين المصدرين فى القرون المفضلة ـ وأقامت أكبر دولة وأروع حضارة على أساس التوحيد والسنة فنحن ورثة تلك الحضارة القيمة .

أهل الحديث حفاظ الدين الحق :

معنى أهل الحديث أتباع القران والحديث وهم الطائفة من المسلمين الحقة التى تعتصم بالكتاب والسنة وتتبع منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين فى تقديم الشرع على جميع أراء وأفكار الإنسان المختلفة سواء كان ذلك فى مجال العقيدة والعبادة والمعا ملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة فلا يزالون يتمسكون بالكتاب والسنة فى كل مجال من مجالات الوصول والفروع ـ فأهل الحديث يقومون بأداء واجباتهم فى نشر العلم النبوى الخالص نحو الاخرين ويدافعون عنه تحريف المتعصبين ومحدثات المنحرفين وتأويل الجهال ـ فيعرفون فى أوساط أهل الفكر بأهل الحديث فى حين وبأصحاب الحديث وبالمحمديين وبالسلفيين فى أحيان أخرى .

لابد أن تفكر!

ليست هذه الدنيا منزلك الحقيقى و الأبدى فإنك سوف تبدأ حياتك الخالدة بعد موتك وتسئل يوم القيامة عن كل عمل عملته فى الدنيا فلا ينفعك ذلك اليوم الا عملك الصالح فيسعد الصالحون برضوان الله ويدخلون جنة النعيم و اما المجرمون فيصلون سعيرا وساءت مستقرا ـ فهل تزودت ايها الشاب لتلك الحياة الأبدية ؟

موجز تعريف

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

ايها الشاب ! هل تعرف من أنت ؟

أنك من أشرف خلق الله رغم أنك عبده :

والإنسان من أبدع وأنيق خلق الله فما هذا الكون العظيم والنعم الكثيرة التى لاتكاد تحصى إلا لسد حاجة الإنسان، فليكن أساس عمله على عبادته حيث يقول الله جل وعلا " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » (الذاريات : ٥٦)

خليفة الله فى الأرض :

وللانسان تعريف ذو افتخار وله مسؤلية خليفة الله فى الأرض فيحقق مسئوليته باتباع شريعة الله وتنفيذها فى جميع شؤون حياة الفرد والمجتمع وعليه مدار النجاح فى الدنيا والاخرة .

أمة سيد الأنبياء وعضو خير أمة :

وقد أدى الرسل عليهم السلام مسئو لياتهم العظيمة في كل زمن بتبليغ دين الله المتين فسلسلة من ذلك قد تلقينا الإسلام دينا شاملا للحياة البشرية عن طريق أفضل إنسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحنا خير أمة بقبول هذا الدين الحنيف حيث يقول الله جل وعلا « كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (ال عمران :١١٠)

منهاج العمل : اتباع شريعة الله جميعا :

يحتاج الإنسان لأداء هذه المسئولية إلى الجهود الجماعية والاتباع الخالص لكتاب الله وسنة نبيه المصطفى عليه أفضل التحيات . قال الله عزوجل " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " (ال عمران :١٠٣)

التذكار - ٢٠٠٢

الناشر

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

١٧٦/٦ شارع نواب فور، داكا - ١١٠٠

المستشار الأعلى

الاستاذ الدكتور محمد عبد البارى

مجلس الاستشار

الاستاذ أ.ك.م شمس العالم
الاستاذ أ.ح.م. شمس الرحمن
الاستاذ مير عبد الوهاب اللبيب
الاستاذ محمد عبيد الله غضنفر

رئيس التحرير

افتخار العالم مسعود

هيئة التحرير

محمد عبد المالك
محمد غلام الرحمن
محمد عبد المتين
محمد شريف الاسلام

تنضيد كمبيوتر

ساجد الرحمن

النشر

ذو القعدة : ١٤٢٢هـ
فبراير : ٢٠٠٢م
فالغون : ١٤٠٨ب

سعر النسخة : ٣٠ تاكا

بسم الله الرحمن الرحيم

التذكار

المؤتمر الدولى ٢٠٠٢م

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

المكتب الرئيسى : ١٧٦ شارع نواب فور، داكا - ١١٠٠، التلفون والفاكس : ٩٥٦٦٧٠٥

ইসলামী ব্যাংক

আন্তরিকতাপূর্ণ দক্ষ সেবায় নিয়োজিত

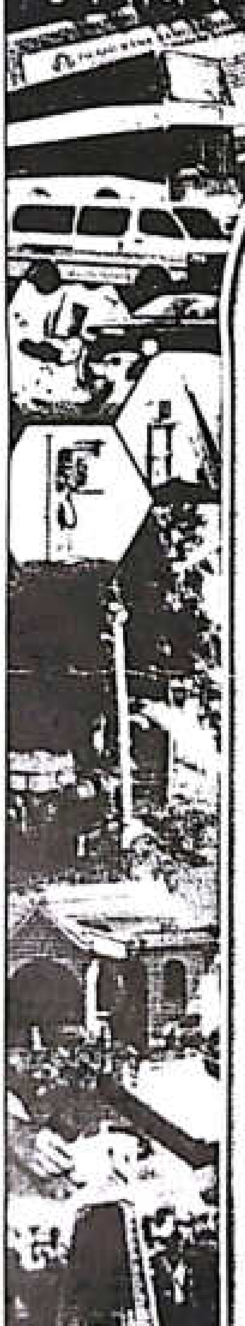

এক নজরে বিভিন্নমুখী সেবা ও কর্মসূচী

- প্রতি শাখায় কম্পিউটারসহ সুইফট, ই-মেইল প্রভৃতি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ সেবার নিশ্চয়তা প্রদান।
- ব্যাংকিং খাতে সর্বপ্রথম ওয়েব সাইট চালু করে ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যাবলী অবহিতকরণ।
- প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক ডিভিশনে ডিলিং রুম (Dealing Room) ও রয়টার সার্ভিস চালু করে দ্রুত আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন।
- বিশ্বব্যাপী ৭৭৫টি বিদেশী ব্যাংক ও করেসপন্ডেন্ট-এর মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনায় স্থানীয় ব্যাংকসমূহের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান।
- দৈনন্দিন ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে নিজস্ব কম্পিউটার সফটওয়্যার আইবিবিএস (IBBS) ব্যবহার।
- নির্বাচিত শাখাসমূহে এটিএম (ATM) সুবিধা চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বিভিন্ন শাখায় লকার সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে।
- আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব এবং মুদারাবা ভিত্তিক সঞ্চয়ী ও বিভিন্ন মেয়াদী হিসাব ছাড়াও অধিকতর মুনাফা ভিত্তিক মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব (হজ্জ পালনে ইচ্ছুকদের সঞ্চয় গড়ে তোলার জন্যে ১ বছর থেকে ২৫ বছর মেয়াদী), মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) হিসাব (৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদী), মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব (সঞ্চয়) ও মুদারাবা মাসিক মুনাফা সঞ্চয় হিসাব খোলার এবং মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড (৫ বছর ও ৮ বছর মেয়াদী) ক্রয়ের জন্য ব্যবস্থা বিদ্যমান।
- সীমিত আয়ের চাকুরীজীবী ও পেশাজীবীদের গৃহ সামগ্রী ক্রয় ও জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য গৃহ সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প ও কার বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করে এ ক্ষেত্রে ব্যাংকিং জগতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প, ...কার বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প ও মিরপুর সিল্ক উইভারস ইনভেস্টমেন্ট স্কীমের আওতায় সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা।
- আবাসন সমস্যা লাঘবে গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প ও রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম।
- গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আদর্শ গ্রাম গঠনে নিয়োজিত।
- এ ছাড়াও শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি, রিয়েল এস্টেটসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান।

শাখাসমূহকে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের আওতায় এনে রেমিটেন্স প্রক্রিয়া দ্রুততর করা হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকের উন্নত সেবা গ্রহণ করে অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

التذكار

٢٠٠٢

جمعية شبان اهل الحديث بنغلاديش

CS CamScanner